আট আনা সংস্করণ

[৩য় গ্রন্থ]



শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত



৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ফাল্গুন, ১৩২৩

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক-ষ্টল
৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

Printed by P. Chakraberty, Manager,
AT THE SHAHITYA SANGHA PRESS,
62-2-1, Beadon Street, Calcutta

উপহার

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই নরু,

তুমি আগ্রহ করিয়া আমার বইগুলি ছাপাইয়াছিলে বলিয়া আমি সাহিত্য-সেবায় যে উৎসাহ পাইয়াছি, তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই বইখানি তোমার করে অর্পণ করিলাম।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

উপহার পৃষ্ঠা



এই গ্রন্থখানি

আমার ....

....কে

....দিলাম।

তারিখ
সন } শ্রী

ভূমিকা

আঠার বৎসর পূর্ব্বে, ইং ১৮৯৯ সালের "প্রয়াস" পত্রে, "মানস-পরিণয়" নামে একটী "ছোট গল্প" লিখিয়াছিলাম। সেই গল্পটীর আখ্যানবস্তু অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হইল।

১৮ নং কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা,
মাঘ, ১৩২৩ সাল।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আট আনা সংস্করণের ৩য় গ্রন্থ "ইন্দু" প্রকাশিত হইল। সুলভে সৎসাহিত্যের প্রচারোদ্দেশ্যে—ক্ষুদ্রশক্তি আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই আমরা ইহাতে সফলকাম হইব কিনা। এখন শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা ও সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহ দৃষ্টি এতদুভয়ই আমাদের এই 'সিরিজে'র কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমরা কাগজের মহার্ঘতার জন্য ইতি-কর্ত্তব্যাবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম—এই 'সিরিজ' আর প্রকাশ করিব কিনা—বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তখন সাহিত্যের একনিষ্ঠসাধক, সুপ্রসিদ্ধ "গল্পলহরী" সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া পুনরায় এই 'সিরিজ' প্রকাশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; অধিক কি এই 'সিরিজে'র ২য় গ্রন্থ "রবিদাদা", যাহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ করিয়া আমাদের এই 'সিরিজে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া

দেন। তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ উৎসাহ না পাইলে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতাম বলিতে পারি না।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, উঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এই 'সিরিজে'র গ্রাহক হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, কেবলমাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইবেন। যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে আমরা তখনই তাহা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব। এই সংস্করণের ৪র্থ গ্রন্থ জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের মনোমুগ্ধকর উপন্যাস "সমাজ-বিপ্লব" যন্ত্রস্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় উপন্যাস "স্বর্ণ-মরু" ৪র্থ গ্রন্থ ও যতীন্দ্রবাবুর "সমাজ-বিপ্লব" ৫ম গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। "স্বর্ণ-মরু" চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। "সমাজ-বিপ্লব" বৈশাখের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

দোল পূর্ণিমা,
১৩২৩ সাল



ইন্দু ও অজিত।

MANASI PRESS, CALCUTTA.



প্রথম পরিচ্ছেদ

এম্. বি. পাশ করিয়া অজিত কুমার প্রথমে মনে করিয়াছিল সে তাহাদের নিজগ্রাম দুর্গাপুরেই ডাক্তারী করিবে। কিন্তু তাহার গুণের পক্ষপাতী আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই তাহাকে পরামর্শ দিল, কলিকাতায় গিয়া প্রাকৃটিস্ করিলে তাহার সুযশ হইবে—সে তাহার বিদ্যাবুদ্ধির যোগ্য আদর পাইবে। অগত্যা অজিতের জননী শরৎসুন্দরী তাঁহার একমাত্র পুত্র অজিতকে, তাহার ভাবী সুনামের কামনায় কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনুমতি দিলেন ; নতুবা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অজিত পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করে। অজিতের পিতা স্বর্গীয় শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যে জমিদারী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকা হইবে। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য অজিতের প্রবাসে থাকিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা দুর্গাপুরের বনিয়াদি জমিদার—তাঁহাদের দুই বিঘা ভদ্রাসন—বৃহৎ পরিবার। কালবশে পৃথগান্ন হইলেও পুরুষানুক্রমিক দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ, এজমালী দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এখনও একত্রেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বহির্বাটী ও ঠাকুর দালান পৃথক হয় নাই। বিষয়াদি ভাগ হইবার সময় অজিতের স্বর্গীয় পিতা পৈত্রিক বিগ্রহ রাধাকান্তর নিত্য সেবার ভার একাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিগ্রহের সেবা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়াই শরৎসুন্দরী অজিতের কলিকাতায় গিয়া ডাক্তারী করিবার প্রস্তাবে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে অজিত প্রতি সপ্তাহেই দেশে আসিতে পারিবে—কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর দুই ঘণ্টার রেলের পথ—এইরূপ বুঝাইলে তিনি শেষে সম্মতি দিলেন।

শরৎসুন্দরীর এক জ্ঞাতিভ্রাতা—বিপ্রদাস—সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিত। বিপ্রদাস পোষ্ট আফিসে সামান্য বেতন পাইত। বিপ্রদাসের পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী সুরমা ও একটী পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা—নীলিমা। শরৎসুন্দরী ভাবিলেন, বিপ্রদাসকে সপরিবারে অজিতের বাসায় রাখিলে, অজিতও যত্নে থাকিবে, বিপ্রদাসেরও বাসা খরচ বাঁচিয়া যাইবে। সেই বন্দোবস্তই হইল। অজিত কলিকাতায় আসিয়া বাদুড় বাগানে—

সুকিয়া ষ্ট্রীটের নিকটেই—একটি গলির মধ্যে বাড়ী ভাড়া করিল। ঐ বাড়ীতে পূর্ব্বে ছাত্রদের মেস্ ছিল। স্কুলে ও কলেজে পড়িবার সময় অজিত পাঁচ বৎসরের অধিককাল ঐ বাড়ীতে বাস করিয়াছিল। মধ্যে প্রায় সাত বৎসর সেই বাড়ীতে জনৈক ভদ্রলোক অধিক ভাড়া দিয়া সপরিবারে বাস করিতেন বলিয়া সেই মেস্ স্থানান্তরিত হয় এবং মেডিকেল কলেজে পাঠ করিবার সময় অজিতকে বহুবাজারে অন্য বাসায় থাকিতে হয়। অজিত কিন্তু বাদুড় বাগানের সেই বাড়ীটির ও নিভৃত পল্লীর প্রতি মমতা ভুলিতে পারে নাই। ডাক্তারী করিতে আসিয়া সেই বাড়ীটি খালি পাইয়া অজিত সেই বাড়ীই ভাড়া করিল এবং নূতন গাড়ী ঘোড়া, দাস দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া এবং তাহার বংশ-মর্য্যাদার ও ডাক্তারের সম্ভ্রমের উপযোগী টেবিল চেয়ারাদি আসবাবে সুসজ্জিত করিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিল। বিপ্রদাস সপরিবারে আসিয়া তাহার অভিভাবক স্থানীয় হইয়া রহিল।

সেই বাটীতে আসিবার মাসেককাল পরে একদিন অজিত তাহার রোগী দেখিবার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটী কেনেরী পক্ষী রাস্তার ধারের মুক্ত বাতায়ন দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কড়ি কাঠের কাছে ঝট্‌পট্ করিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সম্মুখের

ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া একটী বালিকা শূন্য পিঞ্জর হস্তে "ঐ উড়ে গেল!" বলিয়া কাতর স্বরে অনুচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল। অজিত সেই বালিকার মুখের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিল এবং চকিতের মধ্যে তাহার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের খড়খড়ির ও দ্বারের কপাট বন্ধ করিয়া বহুকষ্টে পাখীটিকে ধরিল। ধৃত পক্ষীটিকে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া অজিত দেখিল বালিকাটী তখনও উৎকণ্ঠিতভাবে জানালার কাছে খাঁচা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অজিত পক্ষীটি লইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই বালিকার মুখে কৃতজ্ঞতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। অজিত নিকটে যাইতেই কিন্তু বালিকা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেল। অজিতও কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছিল; সে 'বালিকা' মনে করিয়া নিকটে আসিয়াছিল, কিন্তু নিকটদৃষ্টিতে দেখিল বালিকা নহে যৌবন-শ্রীময়ী নারী-মূর্ত্তি। অজিত কিয়ৎক্ষণ সেই জানালার কাছে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর দ্বারে গিয়া কড়া নাড়িল। সেই শব্দ শুনিয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ক্ষুদ্র জানালার ভিতর হইতে তাহাকে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই ব্যগ্রভাবে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন "এই যে—তুমি পাখীটিকে ধরেছ! বাঁচালে বাবা, নইলে ইন্দু যে কি করত তা বলতে

পারি না।" অজিত প্রৌঢ়াকে চিনিতে পারিয়া বলিল "আপনারাই তা হ'লে এখনো এ বাড়ীতে আছেন? ইন্দু কি আপনার সেই ছোট মেয়েটি না কি? যে আগে আমাদের বাসায় শিউলী ফুল কুড়তে যেত?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, সে—ই ইন্দু। আয় না ইন্দু পাখীটা নিয়ে যা।"

ইন্দু দ্বারের অন্তরাল হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া খাঁচাটি অজিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল। অজিত খাঁচার মধ্যে পাখীটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া খাঁচার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "লজ্জা কি? ছেলে বেলা ওঁদের বাসায় গিয়ে কত উপদ্রব করতিস্, নমস্কার কর।"

ইন্দু ধীরে ধীরে ব্রীড়াবনত বদনে দ্বারের কাছে আসিয়া অজিতকে ভূমিষ্ঠা হইয়া নমস্কার করিল।

অজিত বলিল "থাক্ থাক্; ইন্দু এত বড় হয়েছে! আমি জানালার কাছে গিয়ে চিন্‌তেই পারিনি।"

প্রৌঢ়া উত্তর দিলেন "মেয়ের বাড় কলাগাছের বাড়, বাবা! আর তোমরা এ বাসা ছেড়ে গিয়েছিলে সেও সাত আট বছর হতে চল্‌ল। তুমিই আবার ডাক্তার হয়ে ঐ বাড়ীতে এসেছ শুনে খুব খুসী হয়েছি বাবা! আমাদের আপদে বিপদে একটা ভরসা হল।"

অজিত কিছু অপ্রতিভ হইয়া প্রৌঢ়াকে প্রণাম করিয়া কহিল "এখানে এসেই আপনাদের খবর নেওয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু আপনারাই যে এখনো এবাড়ীতে আছেন তা' জানতুম না বলেই খবর নিইনি। সে জন্যে কিছু মনে করবেন না।"

প্রৌঢ়া। "বেঁচে থাক, রাজা হও। তাতে আর হয়েছে কি, বাবা? কলকাতা সহরের ভাড়া বাড়ীতে আজ একজন আছে, কাল আর একজন আসছে। আমরা এখানে দশ বার বছর আছি বলেই পাড়াটাকে আমাদের আপনার বলে মনে করি।"

ইন্দুর সীমন্তে সিন্দূর রেখা নাই দেখিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল "ইন্দুর বিয়ের সম্বন্ধ টম্বন্ধ আসছে কি?"

প্রৌঢ়া সেই প্রশ্নে প্রথমে যেন একটু চকিতা হইয়া পরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন "না বাবা, তেমন ভাল সম্বন্ধ আসছে কই। আমাদের মত গরীবের ঘরে ত মনের মত সম্বন্ধ সহজে জোঠে না। আর আমাদের কুলীন বামুনের ঘরে মেয়েদের বড় হয়েই বিয়ে হয়।"

অজিত ইতঃপূর্ব্বে ইন্দু যে বয়স্থা হইয়াছে সেইরূপ ইঙ্গিত করাতে অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না, সে কথা বলছি না,—ইন্দু এমন কি বড় হয়েছে—তা নয়।"

প্রৌঢ়া। বড় হয়েছে বই কি বাবা।

অজিত। তা কি করবেন, আপনাদের আবার কুলের হাঙ্গামা আছে।

প্রৌঢ়া। না বাবা ভাল ছেলে পেলে ওসব কুলটুল বাছব না। কুল বাছতে গিয়ে কি মেয়েটাকে জলে ফেলে দেব? তা পারব না।

অজিত। তা ত ঠিক। আচ্ছা তা হ'লে এখন আসি। আমাদের বাড়ীতে মামীমা একলা থাকেন, দুপুর বেলা ও গলিতে লোকজন বেশী চলে না। আপনাদের কথাবার্ত্তা হতে পারবে—আমি মামীমাকে বলে দেব অখন।

এই কথা বলিয়া অজিত নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দুর মা'র সহিত যেদিন অজিতের উক্তরূপ কথোপকথন হইল, সেই দিনই অপরাহ্লকালে ছাদে দাঁড়াইয়া অজিতের মাতুলানী ইন্দুর মার সহিত আলাপ করিলেন। তৎপরদিন ইন্দুর মা, মধ্যাহ্ন কালে আহারাদির পর অজিতদের বাসায় বেড়াইতে গিয়া, অজিতের মাতুলানীর সহিত সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করিলেন। ইন্দুদের ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীর ছাদ অজিতদের বাড়ীর ছাদ হইতে এবং অজিতের দ্বিতলের শয়ন কক্ষের জানালা হইতে সমস্তই দেখা যাইত এবং অজিতের বাহিরে বসিবার কক্ষের জানালার সম্মুখেই ইন্দুদের বাড়ীর ভিতরের ঘরের একটি জানালা থাকাতে, দিবসের মধ্যে একাধিকবার ইন্দু অজিতের নয়নপথে পড়িত। প্রথমে প্রথমে অজিতের চক্ষে পড়িলে ইন্দু সঙ্কুচিতা হইত, কিন্তু তাহাতে নিজেই লজ্জিতা হইয়া ক্রমে সে সঙ্কোচভাব ত্যাগ করিল এবং সহজ ভাবেই অজিতের সম্মুখে বাহির হইত। ক্রমে সেই দেখা সাক্ষাতে অজিত এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, ইন্দুদের ছাদের উপর টবের গাছে জল দিবার সময় অথবা জানালার সম্মুখে পাখীর খাঁচা ঝুলাইবার সময়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দুকে যেদিন অজিত দেখিতে না পাইত সেদিন যেন অজিতের কি একটা অশান্তি বোধ হইত।

ইন্দুদের বাড়ীতে পুরুষ মানুষের মধ্যে একজন মাত্র বৃদ্ধ লোক। ইন্দুর মা তাঁহাকে কাকা বলিতেন এবং পাড়ার লোকেরা তাঁহাকে হরিশ ঠাকুর বলিত। হরিশ ঠাকুর ইন্দুদের দোকান বাজার করিত এবং অবসর কালে দ্বারে বসিয়া একটি ডাবা হুঁকায় তামাকু সেবন করিতে করিতে পল্লীবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা যে সম্মুখ দিয়া যাইত তাহারই কুশল জিজ্ঞাসা করিত। হরিশ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে অজিতের কাছে আসিয়া বসিত এবং গল্প করিত। তাহার নিকট অজিত কথায় কথায়—বিনা জিজ্ঞাসায়—ইন্দুদের পরিচয় পাইল। ইন্দুর যখন দুই বৎসর বয়স সেই সময়ে ইন্দুর মা—সাবিত্রী—বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করেন। সাবিত্রীর পিত্রালয় বিল্বগ্রামে। পিতার মৃত্যুর পর সাবিত্রী কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাই সুদে খাটাইয়া, এবং পশমের টুপি, গলাবন্ধ, মোজা, পুঁথির জুতা, রেশমের ও সুতার লেস্, চিকণ কাজের রুমাল প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া সাবিত্রী সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইন্দুকে কিন্তু তিনি ধনবান লোকের কন্যার মত স্কুলে ও বাড়ীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন। ইন্দু ব্যতীত সাবিত্রীর পতিকুলে, অথবা পিতৃকুলে আর কেহ

আপনার জন নাই। হরিশ ঠাকুরও তাঁহার নিকটাত্মীয় নহেন। তাঁহাদের এক গ্রামে বাস ছিল। সাবিত্রীর পিতা হরিশ ঠাকুরকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং নিরাশ্রয় বলিয়া সপরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সাবিত্রীও হরিশ ঠাকুরকে আপনার পিতৃব্যের মতনই যত্ন করেন, হরিশ ঠাকুরেরও সাবিত্রী ও ইন্দু ব্যতীত আপনার বলিতে ত্রিসংসারে আর কেহ নাই। সাবিত্রী ও ইন্দুর সুখ্যাতি হরিশ ঠাকুরের মুখে ধরিত না। অজিতের নিকট আসিয়া হরিশ ঠাকুর যেদিন সাবিত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার ও ইন্দুর শিল্পনৈপুণ্যের কথা পাড়িত সে দিন সেকথা যেন আর ফুরাইত না, এবং অজিতেরও সে কথা শুনিতে কিছুমাত্র আলস্য বোধ হইত না। সেই সুত্রে উভয়ের মধ্যে একটা স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন আসিয়া পড়িল।

অজিত প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে গাড়ী করিয়া রোগী দেখিতে বাহির হইত, অথবা সে প্রয়োজন না থাকিলেও, বিষয়-বুদ্ধিমান বন্ধুবর্গের পরামর্শে রোগী দেখিবার ব্যপদেশে একবার করিয়া গাড়ির সম্মুখের বসিবার আসনে 'এ. কে, মুখার্জ্জি এম্ বি,' লেখা একটি বিলাতী চামড়ার ব্যাগ রাখিয়া কলিকাতার বড় রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। গাড়ীতে উঠিবার সময় একবার হরিশ ঠাকুরের কাছে গিয়া তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করা অজিতের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসের

মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। একদিন প্রাতে বাহিরে যাইবার সময় হরিশ ঠাকুরকে বাড়ীর দ্বারে বসিয়া থাকিতে না দেখিয়া অজিত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ইন্দুদের দ্বারের নিকটে গিয়া ডাকিল "চাটুর্য্যে মশায়, বাড়ী আছেন ?"

তাহার গলা পাইয়া সাবিত্রী দরজার পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "কাকার পায়ে কাল হোঁচট্ লেগে পা টা কি রকম মুচ্‌ড়ে গেছে—তাই আজ আর উঠতে পারেন নি।"

অজিত। তাই বটে কাল বিকেল থেকেই তাঁকে দেখতে পাইনি। বেশী লাগেনি ত ? চলুন না একবার দেখে আসি ?

সাবিত্রী। এস বাবা—লেগেছে বেশীই বোধ হয়।

বাটির ভিতরের সম্মুখের ঘরের ঘেরা দালানেই এক খানি তক্তাপোষের উপর হরিশ ঠাকুর শুইয়া ছিল। অজিতকে দেখিয়াই সে বলিল "এস ভায়া, কাল রাত্তিরে ভারি যাতনা হচ্ছিল। সাবিত্রীকে বল্‌লাম্ তোমাকে ডেকে পাঠাতে—তা ওঁরা বল্লেন—"

সাবিত্রী বাধা দিয়া বলিলেন,—"চুণ হলুদ গরম করে দিয়ে ছিলুম—মনে করেছিলুম তাতেই কমে যাবে।"

হরিশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"তা ওঁরা বল্লেন তুমি ত আর টাকা নেবে না—রাত্রিরে ডাকা কি ভাল দেখায় ?"

সাবিত্রী। না বাবা সে জন্যে নয়—সামান্য অসুখ করলেই ত আর আমরা ডাক্তার ডাকি না।

অজিত অনুযোগের স্বরে বলিল—"তা না হোক—আমি যখন কাছে রয়েছি—"

সাবিত্রী। তা বটে বাবা—তুমি ত আপনার লোকেরই মত, আমাদের রোজ খোঁজ খবর নাও—তা কি আর জানি না। এখন যা'তে বুড়ো মানুষ শীগ্‌গির সেরে ওঠেন তাই করো বাবা।

অজিত হরিশের পায়ের গ্রন্থি পরীক্ষা করিয়া বলিল "না, পা—টা সামান্য মচ্‌কে গিয়ে ফুলে উঠেছে, আমি একটা লোশন দিচ্ছি, সেইটে দিয়ে বেঁধে রাখলেই সেরে যাবে। আমি আবার আসব অখন।"

যাতনা পরদিন কমিয়া গেল, কিন্তু ব্যথা কমিল না। অজিত ব্যাণ্ডেজ্‌ বাঁধিয়া দিয়া গেল। হরিশ ঠাকুর দিনের মধ্যে দুইবার তাহা খুলিয়া ফেলিতেন—নহিলে অশুচি হইবে। ইন্দু আবার তাহা বাঁধিয়া দিত। অজিত সে কথা শুনিয়া, প্রশংসমান দৃষ্টিতে ইন্দুর বাঁধা ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া বলিল, "বাঁধা ঠিক হয়েছে—একবার দূর থেকে দেখেই ইন্দু বেশ পরিষ্কার বেঁধেছে ত?"

হরিশঠাকুর বলিল, "দিদির আমার সব কাজই পরিষ্কার—কোন কাজ কর্ম্ম দুবার দেখাতে হয় না।"

অজিতের চিকিৎসা এবং ইন্দুর শুশ্রূষা সত্বেও হরিশঠাকুরের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পায়ের বেদনা সারিতে সপ্তাহ কাল লাগিল। সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইবার কয়েক দিন পরে হরিশঠাকুর একদিন অজিতকে বলিল, "ভায়া, আমার বড় সাধ তোমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই, তা তুমি যদি গরিবদের বাড়ী—"

অজিত। বলেন কি? বামুনকে ফলারের লোভ দেখালে আর রক্ষে আছে! যে দিন বলবেন গিয়ে খেয়ে আসব—তা লুচি টুচির হাঙ্গাম করবেন না, সকাল বেলা দুটী ভাত খাইয়ে দেবেন, আমার সকাল বেলা মানে দ্বিপ্রহর।

হরিশ। তাই হবে ভায়া, তা হলে কালকেই কথা রইল, কেমন? বিপ্রদাস বাবুকেও বলতাম কিন্তু উনি যে সকালে কুঠী যান, ওঁর কি সুবিধে হবে?

অজিত। না না—মামা কি করে যাবেন? আমিই যাবো; সে জন্যে কিছু মনে করবেন না।

পর দিন হরিশঠাকুরের সহিত একত্রে ভোজনে বসিয়া অজিত ব্যঞ্জনাদির বাটির শ্রেণী দেখিয়া বলিল—"এর মধ্যে এত রাঁধলেন কি করে?"

সাবিত্রী বলিলেন—"একা রাঁধিনী বাবা, আমি নিরমিষ্যি তরকারি গুলো রেঁধেছি, মাছের যা কিছু সবই ইন্দু রেঁধেছে।"

অজিত সমস্ত ব্যঞ্জনই কিছু কিছু আস্বাদ করিল, শেষে মিষ্টান্নের রেকাবির দিকে চাহিয়া বলিল, "ও সব আর খেতে পারবো না।"

সাবিত্রী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা বাবা! ও সব ত দোকানের কেনা নয়; সন্দেশ, ক্ষীরের কদমা, চন্দ্রপুলী, মনোহরা সবই ইন্দু ঘরে করেছে। একটু একটু খেয়ে দেখ বাবা।"

অজিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রত্যেক মিষ্টান্ন হইতে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া খাইয়া, একেবারে উঠিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ওকি হ'ল বাবা! আর কিছু খেলে না,—রান্না বান্না কি রকম হয়েছে? ছেলে মানুষ রেঁধেছে।"

অজিত আচমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হবে আর কি—ছেলে মানুষ গিন্নিদের হারিয়ে দিয়েছে—কোনটাই ত নিন্দের পেলুম না? সমস্ত জিনিষই ভাল হয়েছে।"

হরিশ ঠাকুর মহা প্রীত হইয়া বলিল "শুধু রান্নায় নয়—নাতনি আমার শিল্পকাজও খুব ভাল জানে; কেমন ছবি বুনেছে দেখেছ?" এই কথা বলিয়া আচমন শেষ করিয়া হরিশ ঠাকুর গৃহের মধ্য হইতে বুনিবার ফ্রেমে আঁটা মখমলের উপর রেশমে বোনা একখানি ছবি আনিয়া অজিতের হস্তে দিল। অজিত সেই সূচীকর্ম্মের চিত্র দেখিয়া যথার্থই বিস্ময়ান্বিত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্তিম ফুলের গুচ্ছ ও পত্রবিশিষ্ট একটি বৃক্ষশাখার উপর বসিয়া একটি কেনেরী পক্ষী একটি স্বর্ণাভ সুপক্ক কেনেরী বীজের পক্ক শীষের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া

গাছে। পাখীটি ইন্দুর পোষা পাখীটির অবিকল প্রতিরূপ এবং রেশম গুলি এরূপ সুন্দর ভাবে রংএর শেড মিলাইয়া বোনা হইয়াছে যে পাখীটিকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মখমলের ভূমিতে যেন জীবন্ত দেখাইতেছে এবং কেনেরীবীজের শীষটি ও গাছের ডালটি সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অজিতের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি স্বতঃই নিঃসৃত হইল, "চমৎকার! বেশ শিখেছে ত!"

হরিশ বলিল "ইন্দু যে মেমের কাছে শিখেছে, তিনিই ওর কাজের কত সুখ্যাত করেন। আর সাবিত্রী নিজেও খুব শিল্প কর্ম্ম জানেন, ধানের হার, আলপনা, কাগজের ফুলকাটা, খয়েরের গহনা গড়া, কাপড়ের ফুলের মালা গাঁথা, আর ভাল ভাল খাবার দাবার তৈরী করার জন্যে আমাদের গ্রামে ওঁর খুব নাম হয়েছিল।"

অজিত কহিল, "তা আর বুঝতে পারছি না! নৈলে সুধু স্কুলে কি আর এমন শেখা হয়। আমার ইচ্ছে করছে ছবি খানা নিয়ে গিয়ে পাঁচ জনকে দেখাই।"

হরিশ হাস্য-বিকশিত মুখে বলিল, "তবে কথাটা বলে ফেলি ভায়া। ইন্দু যখন ছবি খানা বুনছিল, আমি বল্লাম অত যে মেহনত করছ—ওর কি দাম উঠবে!" ইন্দু বললে, "না দাদামণি, এ ছবি বিক্রী করব না।" আমি বললাম, "তবে ফ্রেম করে টাঙ্গাবে?" ইন্দু হাঁ কি না, সে কথার কোন উত্তরই দিলে না।

আমি বল্‌লাম "তবে কি কারুকে দেবে নাকি?" ইন্দু বল্‌লে "কাকে আর দেব?" আমি বল্‌লাম "কেন অজিত বাবুকে দাওনা? যে পাখীর নকল করেছ সেটাত উনিই ধরে দিয়েছিলেন; আর ডাক্তার মানুষ—আপদে বিপদে উপকার পাওয়া যেতে পারবে; কিছু মনে করোনা ভায়া, তখনও ত তোমার সঙ্গে আলাপ হয় নি। তাতে উত্তর হলো "উনি এ ছবি নিয়ে কি করবেন, কত ভাল ভাল ছবি কিনে এনেছেন; ঐ দেখুন না কত দামী, কি চমৎকার একখানা ছবি দেখা যাচ্ছে; ঐ কথা বলে তোমার বাইরের ঘরের কোণে দাঁড় করান মোটা গিল্টি করা ফ্রেমে যে ছবিখানা আছে, সেখানা দেখালে।"

অজিত হাসিয়া বলিল "ও! ঐ র‍্যাফেলের ম্যাডোনার কাপিখানা; ওসব মেকেঞ্জী লায়ালের নিলাম থেকে কিনে এনেছি। ও ত দাম দিলেই পাওয়া যায়, কিন্তু এমন যত্ন করে ছবি বুনে দেয় কে? তাহলে আমি ছবিটা নিয়ে

সাবিত্রী বলিলেন, "সে ত আহ্লাদের কথা। কিন্তু বাঁধানো হলো না যে!"

অজিত বলিল "বাঁধিয়ে আমি নেবো এখন। আমার একজন চেনা ফ্রেমওয়ালা আছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাবিত্রী :"তবে দে মা ইন্দু, ছবিটা কাঠামো থেকে খুলে দে ?" ইন্দু ছবি খানি খুলিয়া দিলে, অজিত তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিনই বৈকালে ছাদের ফুলগাছের টবে জল দিতে গিয়া ইন্দু দেখিল অজিতের শয়ন কক্ষের মুক্ত বাতায়নের সম্মুখের দেওয়ালে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাইয়া তাহার কেনেরী পাখীর ছবিখানি ঝুলিতেছে।

বালককালে অজিতের ফুলগাছের, পাখী পুষিবার, সাজ-সজ্জার প্রভৃতি নানা বিষয়ে সখ ছিল। কিন্তু কলিকাতার বাড়ীতে আসিবার পর সেই সব সখ নিবৃত্তি লাভ করে। ডাক্তারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই সে তাহার বাসাবাটী ছবি, চেয়ার, টেবিল, আলমারী প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়াছিল ; নতুবা তাহার সে সকল বিষয়ে যে বিশেষ কোনও আগ্রহ আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই একটা দুর্ঘটনায় তাহার সদা প্রফুল্ল বদনে যেন একটা অকাল গাম্ভীর্য্য আনিয়া দেয়। অজিত যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, সেই বৎসরই অজিতের মাতা শরৎসুন্দরী অজিতের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারের কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন, এবং বিবাহের ছয় মাস পরেই সেই অষ্টমবর্ষীয়া নব বধূর বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয়। তৎপরে শরৎসুন্দরী তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার উদ্যোগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অজিত সম্মত হয় নাই। তাহার জননীর পক্ষ লইয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাহাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে সে বলিত অল্প বয়সে বিবাহ করিলেই নিজের সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য মানব জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য পালন করিবার আর শক্তি থাকেনা। তর্ক করিলে, সে ছাড়িত না। শরৎসুন্দরীও একবার পুত্রের অমতে তাহার বিবাহ দেওয়াতে যে দারুণ অমঙ্গল ঘটে তাহা স্মরণ করিয়া পুনরায় পুত্রের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বিবাহ দিতে সাহস করেন নাই। তিনি শেষে এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে যদি অজিতকে সংসারী করা ভগবানের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তিনিই তাহাকে সুমতি দিবেন। কিন্তু অজিতের মনে তাহার বাল্য ও কৈশোরের স্ফূর্ত্তির অভাব, তাহার পাঠাভ্যাস ব্যতীত অপর কোন বিষয়েই পূর্ব্বের মত কোনও সখ নাই, লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন।

ইন্দুদের বাটী হইতে আসিয়া সেই কেনেরী পক্ষীর ছবিখানি খাটাইবার পর হইতে হঠাৎ অজিতের মনে, তাহার বাল্য ও কৈশোরের বহুদিন লুপ্ত 'সখ' যেন নবজীবন লাভ করিয়া সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে মাণিকতলা হইতে ফরমাস দিয়া প্রস্তুত করা বড় বড় টবে বেল, জুঁই, গোলাপ গাছের সারি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার শয়ন কক্ষের সম্মুখের ছাদে, আলিসার উপর শ্রেণী দিয়া বসাইল; হগ্ সাহেবের বাজার হইতে নানা জাতীয় ফার্ণ, ক্রোটন্, পাম প্রভৃতি নানা দেশের বাহারি গাছ আনিয়া তাহার বাসার ক্ষুদ্র উঠানকে কুঞ্জবনে পরিণত করিল; একজন মালী রাখিয়া তাহার সহযোগে অবসরকালে সেই গাছ গুলির পরিচর্য্যায় যত্নবান হইল। তাহার নিজের বেশ ভূষার বিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং তাহার মনের আনন্দ নানা বিষয়ে প্রকট হইয়া উঠিল এবং সে তাহা আত্মীয় পরিজনের অন্তরেও সঞ্চারিত করিল। তাহার সেই অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির ও জীবনের গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতুলানী সুরমা দুর্গাপুরে শরৎসুন্দরীকে পত্র লিখিলেন। শরৎ-সুন্দরী সে সংবাদে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কি কারণে অজিতের মনে সেই পরিবর্ত্তন ঘটিল, নববসন্ত তিরোধানের এতদিন পরে, কেন যে অজিতের নীরস হৃদয়তরু সহসা পত্র-পুষ্পে মুঞ্জরিয়া উঠিল, তাহার নীরস জীবনকুঞ্জ শত-পিক-কুহরিত, অযুত-ভ্রমর-ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাহা সুরমা বা বিপ্রদাস বুঝিতে পারিল না, বোধ হয় অজিত নিজেও তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে নাই। তৎকালে তাহার সে অবসর ছিল না—সে তখন নিজের ভাবেই বিভোর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অজিত রোগী দেখিয়া আসিয়া গাড়ি হইতে নামিতেছে এমন সময় দেখিল একজন বিধবা স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। অজিত উপরে গিয়া তাহার মাতুলানী সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর ভেতর থেকে কে ও স্ত্রীলোকটী বেরিয়ে গেল মামি মা?

সুরমা অজিতের প্রায় সমবয়স্কা, দুই এক বৎসরের বড় হইতে পারেন।

সুরমা বলিল, "ও একজন ঘটক ঠাকরুণ।"

অজিত। "এখানে এসেছিল কেন?"

সুরমা। এখানে উনি আরো দু এক দিন এসেছিলেন, প্রথম দিন এসেছিলেন, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। তা' তুমি ত আর এখন বিয়ে করবে না, তখন আর তোমার সে সকল শুনে দরকার কি?

অজিত। তবু শুনি না, কেন এসেছিল?

সুরমা। ওদের ইন্দুর একটা সম্বন্ধ আনতে বলেছিলুম, তাই এসেছিলেন। তা ইন্দুর মার পছন্দ হলো না। ছেলেটী

সওদাগরী আফিসে ৪০ টাকা মাইনে পায়, শ্রীরামপুরে বাড়ী, তা ইন্দুর মা বলেন ছেলেটি তেমন ভাল লেখা পড়া জানেনা, পাশ্ টাস্ করেনি, ওখানে তিনি বিয়ে দেবেন না।

অজিত। তা ত ঠিকই বলেছেন—৪০ টাকা মাইনে; পরে ছেলে পুলে হলে, সংসার চালাবে কি করে?

সুরমা। তেমন কিছু দিতে ত পারবেন না; ওর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ জুটবে কি করে?

অজিত। কেন? সবাই কি টাকাই খোঁজে, ভাল মেয়ে কি কেউ চায় না?

সুরমা। মুখে অনেকে চায় বটে, কিন্তু—কিন্তু কাজের বেলা টাকাটাই বড় করে।

অজিত। সবাই তা নয় গো মানী—এই আমিই যদি বিয়ে করি ত, টাকা নেব কি মনে করেছ?

সুরমা। তুমি! তোমার কথা ছেড়ে দাও—তোমার মত ছেলেকে দশহাজার টাকা দিয়েও যে মেয়ে দেবে, সে জিত্‌বে। তা তুমি বিয়ে করতে রাজি হও কই?

অজিত। যদিই হই?

সুরমা। তাহলে আমরা এবার রাজার ঘরের মেয়ে আনব।

অজিত। সে ত একবার এনেছিলে—আবার কেন? এবার রাজার ঘর টর ছেড়ে দিয়ে, খালি মেয়েটিকে আনলে হয় না?

সুরমা। তুমি আগে মন ঠিক করত—তারপর সে কথা ভেবে দেখা যাবে।

অজিত। তা আর ভাবাভাবির দরকার কি মামী—এই ওদের ইন্দুকে যদি আমি বিয়ে করতে চাই।

সুরমা। শোন কথা! তুমি অমন গরিবের ঘরে বিয়ে করতে যাবে কেন! একবার ঘটকদের বললেই কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এনে ফেলবে!

অজিত,। ও সব কথা ছেড়ে দাও—ইন্দুকে তোমার কি অপছন্দ হয়?

সুরমা। ইন্দু মেয়েটি খুবই ভাল—রূপে গুণে ও মেয়ের জোড়া সহজে মিলবে না, কিন্তু অতবড় মেয়ে আমাদের ঘরে কি বিয়ে হয়?

অজিত। আমিও ত আর খোকাটী নই, মামি!

সুরমা। তবু বিয়ের সময় দশজনে দশ কথা বল্‌তে পারে!

অজিত। তাই বা বলতে দেব কেন? যদি বিয়ে করি তা হলে কুটুম্ব জড় করতে, কি ঘটা করতে দেব ভেবেছ নাকি? এবার সে সব করলে ত বিয়েই করব না।

সুরমা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিল, "আচ্ছা; তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো বাপু—বিয়ে করতে রাজি আছ এ কথা ঠিক ত? তাহ'লে দিদিকে লিখে পাঠাই?"

অজিত। তা লেখো, এখন আগে ওঁদের জিজ্ঞাসা কর, কোন আপত্তি আছে কি না।

সুরমা। ওঁদের আবার আপত্তি কি ? এক কুল ভাঙ্গাবার যা আপত্তি ; তা ইন্দুর মা ত আমাকে কতদিন বলেছেন ; ভাল ছেলে পেলে তিনি কুল বাছবেন না।

অজিত। না হয় আবার কথাটা স্পষ্ট করে পেড়ে দেখ।

সেই দিনই মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী অজিতদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে সুরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের অজিতের সঙ্গে ইন্দুর বিয়ে দেবে দিদি ?"

সেই প্রশ্নে সাবিত্রীর মুখমণ্ডল চকিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই যেন আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন "ইন্দুর আমার এমন কি কপাল জোর যে অজিতের হাতে পড়বে !"

সুরমা। অজিত নিজেই সে কথা পেড়েছে ; তাহলে দিদিকে লিখে পাঠাই ?

সাবিত্রী। এ কথার আমি কি উত্তর দেব বোন, এযে আমার বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ান।

সুরমা সেই দিনই দুর্গাপুরে শরৎসুন্দরীকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিল। ইন্দুর রূপগুণের কথা, তাহাদের কৌলীন্যের কথা, অবস্থার কথা, অজিতের প্রস্তাব এবং সাবিত্রীর সম্মতির কথা সমস্তই বিস্তারিত ভাবে সুরমা সেই পত্রে

শরৎসুন্দরীকে জানাইল। শরৎসুন্দরী তাঁহাদের একজন বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে দিয়া নিজ অভিমত বিপ্রদাসকে বলিয়া পাঠাইলেন এবং সুরমাকেও পত্র লিখিলেন। অজিতের পুনরায় বিবাহ করিতে মন হইয়াছে শুনিয়া তিনি কুলদেবতার ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিলেন। যাহাতে শীঘ্রই বিবাহ হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বিপ্রদাসের উপর ভার দিলেন এবং অজিত যে কোনরূপ সমারোহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যাহাতে অজিতের ইচ্ছা নাই, সেরূপ কাজ করিবার প্রয়োজন নাই—তাঁহার অজিত সংসারী হউক—তাহা হইলে সাধ আহ্লাদ করিবার তিনি অন্য সময় অনেক পাইবেন। ভাবী পুত্রবধূর গহনা গড়াইবার ও বিবাহের অনিবার্য্য আয়োজনের জন্য তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে বিপ্রদাসকে অনুমতি দিলেন ও তদুপলক্ষ্যে প্রয়োজন মত অর্থ পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

যে দিন দুর্গাপুর হইতে শরৎসুন্দরীর পত্র লইয়া লোক আসিল, সেই দিনই অজিতকে বলিয়া সুরমা সেই সু-খবর সাবিত্রীকে জানাইল। সাবিত্রী দুইদিন উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন এক্ষণে তিনি আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে সুরমাকে তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। বিপ্রদাস ও হরিশ সেই সংবাদ

শ্রবণে আহ্লাদিত হইল। বিপ্রদাস আগ্রহের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল—স্বর্ণকারের দোকানে আপিসের ছুটীর পরে গিয়া যাহাতে সত্বর সমস্ত অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া উঠে তাহার প্রত্যহ তাগাদা করিতে লাগিল।

পক্ষাধিক কাল পরে বিবাহের দিন স্থির হইল—তৎপূর্ব্বে আর শুভলগ্ন ছিল না। সে কয়দিন আর পূর্ব্বের মত অজিত ইন্দুদের দ্বারে গিয়া হরিশ ঠাকুরের কাছে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। হরিশঠাকুর নিজেই দিনের মধ্যে দুই তিনবার আসিয়া অজিতের কাছে তাহার মনের আনন্দ জানাইয়া যাইত। কয়েক দিন পরেই অজিত যে তাহার নাতজামাই হইবে সে শুভ সংবাদ সে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইন্দু সে কয়দিন পূর্ব্বের মত ছাদের উপর বা জানালার কাছে অজিতের চক্ষে পড়িল না। অজিত বুঝিতে পারিল ইন্দু ইচ্ছা করিয়াই অন্তরালে থাকে—সে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই অবসরে ইন্দু ছাদের গাছে জল সেচন করে। একদিন অজিত বাহিরে যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই কোনও প্রয়োজন বশতঃ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, ইন্দু গাছে জল দিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছে। এই কয়দিনে তাহার দেহলতা যেন কি এক মন্ত্রশক্তিতে অপূর্ব্ব লাবণ্যে ঝল্‌মল্ করিতেছে। অজিতের প্রশংসমান অপলক নয়নের সহিত ইন্দুর দৃষ্টি বিনিময়

হইতেই সে যেন সরমে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এ কয়দিন যে অপূর্ব্ব পুলকে তাহার মন প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল অজিতের মুগ্ধ দৃষ্টি বুঝি তাহার সেই প্রাণের প্রাণে লুক্কায়িত সেই পুলকরত্নটীর সন্ধান পাইয়া গেল। ইন্দু ছুটিয়া পলাইতে পারিল না—সে লাজ-নম্র মিনতিপূর্ণ কটাক্ষে যেন ক্ষমা চাহিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

অজিতের ইচ্ছা মত, বিবাহের দিন উভয় পক্ষেই কোনও সমারোহ হইল না। কিন্তু অজিতের মাতার ইচ্ছানুসারে বিপ্রদাস গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে ইন্দুকে মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ, সজ্জার বিবিধ উপকরণ ও অলঙ্কারাদি পাঠাইলেন। সাবিত্রীও স্বইচ্ছায় আপনার সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া ইন্দুকে বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং অজিতকে তাহার ব্যবহারোপযোগী বরাভরণ ও শয্যাদি দান করিলেন। অজিত তাহার চারি পাঁচটী নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মাত্র নিমন্ত্রণ করিল। সাবিত্রীও স্ত্রী আচার করিবার জন্য তিন ঘর মাত্র প্রতিবেশীদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে কিন্তু নিরুৎসবে সম্পন্ন হইল। অজিতের বন্ধুগণ ইন্দুকে দেখিয়া অজিতের প্রতি প্রজাপতি যে নিতান্তই সুপ্রসন্ন একথা একবাক্যে অজিতকে জানাইয়া দিয়া গেল। পরদিন বর-বধূ লইয়া বিপ্রদাস সপরিবারে দুর্গাপুরে যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রেলের গাড়ীতেই অজিত অসুস্থ বোধ করিতেছিল, বাটী পৌঁছিয়া বরবধূ বরণ করিবার সময় সে কোনরূপে আত্ম-সংযম করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরেই সে প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার পর দুইদিন অজিতের জ্বরে সংজ্ঞাশূন্য ভাবেই কাটিয়া গেল। তৎপরদিন জ্বরের সামান্য উপশম হইল কিন্তু একেবারে জ্বরত্যাগ হইল না। ডাক্তার বলিয়া গেলেন জ্বর রেমিটেণ্ট্ আকার ধারণ করিয়াছে, রোগীকে খুব সাবধানে রাখিতে হইবে, কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নাই। সাবিত্রী যৎসামান্য ফুলশয্যার দ্রব্যসামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন—তাহার ব্যবহার হইল না।

বরবধূ দুর্গাপুরের বাটীতে প্রবেশ করিতেই ইন্দুর রূপের একটা প্রশংসা উঠিয়াছিল—সকলেই বলিয়াছিল—"হ্যাঁ বাড়ীর উপরি বউ এসেছে বটে!" অজিতের জননী নববধূর রূপের সেই প্রশংসা শুনিয়া, আনন্দিতা হইয়া প্রশংসাকারিণী আত্মীয়া ও প্রতিবাসিনীদিগকে বলিয়াছিলেন—"আশীর্ব্বাদ কর আমার অজিতের ঘর যোড়া ক'রে বেঁচে থাকুক।" পরে অজিতের

জ্বর হওয়াতে আর কেহ নববধূর রূপের দিকে চাহিয়া দেখে নাই। ইন্দুও হরিষে বিষাদিনী—নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। সেই দুঃসময়ে ছিদ্রান্বেষীরা বিশেষতঃ ধনাঢোর কন্যা জ্ঞাতি-বধূগণ ও মুখরা জ্ঞাতি-কন্যারা নববধূর নানা ত্রুটী আবিষ্কার করিবার সুযোগ পাইল। কেহ বলিল, দীনদুঃখীর ঘরের মেয়ে নইলে অমন লক্ষ্মীছাড়া বরাত হয়?—ফুলশয্যা—শুভকর্ম্ম—তাও হ'ল না!" কেহ বা টিপ্পনি কাটিল, "তোমরা বলেছিলে দেখতে ভাল, আমি ত বাপু বৌএর ভাল তেমন কিছু দেখতে পাই না। কেমন যেন বেহায়া বেহায়া চাল চলন।" আর একজন বলিল "ঠাকুরঝির এক কথা—ওর কি আর লজ্জা সরম করবার বয়স আছে? ও ত একেবারে গিন্নী হ'য়ে বাড়ী ঢুকেছে।" প্রথম প্রথম অজিতের জননীর ও ইন্দুর সমক্ষে এরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা হইত না, অন্তরালেই হইত। ক্রমে ইন্দুকে শুনাইয়া শেষে শরৎ-সুন্দরীর নিকট প্রকাশ্য ভাবেই একদিন এইরূপ সমালোচনা ব্যক্ত হইল। শরৎসুন্দরীর ননন্দা সম্পর্কীয়া একজন বিধবা এক দিন অজিতকে দেখিতে আসিয়া শরৎসুন্দরীকে শুনাইয়া অপর একজন সঙ্গিনীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল "অত বড়—বৌ জবু থুবু হয়ে বসে থাকে, আর শাশুড়ী রোগা ছেলেকে নিয়ে সারা হ'চ্ছে এটা কি ভাল দেখায়? ভাল ঘরের মেয়েদের

চাল চলন আক্কেলই আলাদা রকমের।" শরৎসুন্দরীর কর্ণে সেই কথা যাইতেই তিনি বলিলেন "বৌমার দোষ কি? আমিই ওঁকে কিছু করতে দিইনি।" সে উত্তরে সন্তুষ্টা না হইয়া পূর্ব্বোক্তা বলিল "সে যেন হ'ল কিন্তু কিরকম অপয়া বৌ বাপু? কোথা থেকে ছেলের জ্বর নিয়ে এল দেখ দেখি।" শরৎসুন্দরী সে কথা শুনিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন "অজিতের আমার জ্বর হ'য়েছে—আশীর্ব্বাদ কর সেরে যাক—বৌমাকে নিয়ে টান কেন?" শরৎসুন্দরীর সেই উত্তর শুনিয়া অবধি জ্ঞাতিরা নববধূর সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিত না। কিন্তু শরৎসুন্দরী ভাবিলেন নববধূকে কাজ কর্ম্ম করিতে দিলেও লোক-নিন্দার ভয়, অথচ তাঁহার বধূ-মাতা নিতান্ত বালিকা নহেন, সুতরাং এই বিপদের সময় নিশ্চেষ্টা হইয়া বসিয়া থাকিলেও প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যে সকলে তাঁহার বধূমাতার অপযশ ঘোষণা করিবে! সেইজন্য তিনি অজিতের সেবা শুশ্রূষার ভার ইন্দুর উপর কিয়দংশ অর্পণ করিলেন। তিনি দিবাভাগে আহারাদি করিতে যাইবার সময় অজিতের মস্তকে জলপটি করিয়া অডিকলোন্ দিতে ও তাহাকে ব্যজন করিতে ইন্দুকে বসাইয়া যাইতেন। পরে যখন দেখিলেন সেই কর্ম্মব্যতীত, চিকিৎসকের আদেশ মত ঔষধাদি যথাসময়ে সেবন করান শয্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি

কার্যাও ইন্দু স্বেচ্ছায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছে, তখন তিনি দিবাভাগের রোগীর সেবাশুশ্রূষার সমস্ত ভারই ইন্দুর উপর সমর্পণ করিলেন। সপ্তাহেক কাল জ্বর ভোগের পর যখন অজিতের পীড়ার শঙ্কট কাটিয়া গেল এবং অজিত দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল, তখন ইন্দুর, অজিতের কাছে থাকিতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল; শরৎসুন্দরী বা অপর কোন গুরুজন্ আসিলেই সে গৃহের বাহিরে যাইত এবং পুনরায় আদিষ্ট না হইলে আসিত না। কিন্তু ইন্দুর সেবায় অজিত যে তৃপ্তি পায়—সে গৃহে থাকিলে অজিতের পীড়া-ক্লিষ্ট মুখ যে প্রসন্নতার ভাব ধারণ করে, তাহা শরৎসুন্দরীর স্নেহদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সেইজন্য ইন্দুকে তিনি নিজেই মধ্যাহ্নকালে আহারাদি করিতে যাইবার সময় পূর্ব্বের মত অজিতের গৃহে রাখিয়া যাইতেন। একদিন সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, ইন্দু ব্যজন করিতে করিতে অজিতকে তন্দ্রাগত ভাবিয়া বসনাঞ্চল দিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার ললাটের স্বেদ বিন্দু-গুলি মুছাইয়া দিতেছে, এমন সময় সহসা অজিত নয়ন মেলিয়া ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, ইন্দু কি ব্যাকুল ও করুণ দৃষ্টিতে তাহার রোগশীর্ণ মুখের দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া আছে! অজিত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ইন্দু! তুমি এখনো বাতাস করছ! থাক্ আর বাতাস

করতে হবে না, এখন আর তত গরম বোধ হচ্ছে না।” সে গৃহে যে পরিচারিকা থাকে সে তখন উপস্থিত নাই দেখিয়া ইন্দু বলিল, “ঘাম হচ্ছে যে—তুমি ঘুমোও; আমার হাত ব্যথা করেনি আর একটু বাতাস করি।” অজিত আপত্তি করিল না।

অজিত যে দিন পথ্য করিল, সেইদিন শরৎসুন্দরী তাঁহার দিদিশাশুড়ী সম্পর্কীয়া ছোটগিন্নীর সহিত মধ্যাহ্নকালে অজিতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন “বউমাকে বিয়ের পর এনে এতদিন রেখেছি আর রাখাটা ভাল দেখায় না, ওঁর মা মনে করবেন তিনি গরিব বলে আমরা যা তা করছি। কিন্তু কি করি বল, অজিতের আমার অত অসুখের সময় ত আর পাঠাতে পারতুম না? আর বৌমার ও যাবার বড় ইচ্ছে ছিল বলে বোধ হয় নি। কিন্তু অজিতও আমার বাবা রাধাকান্তের আশীর্ব্বাদে আজ দুটী পথ্য পেয়েছে—দু চার দিন বাদেই উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে—এখন আর বৌমাকে রাখাটা ভাল দেখায় না। তাই কাল পাঠিয়ে দেবো ঠিক করেছি।”

ছোট গিন্নী বলিলেন, “সেই ভাল, যাত্রাটা বদলে আসুন। কি অশুভক্ষণে পা বাড়িয়েছিল—বাছা আমাদের কি নাটাপাটাই খেলে।”

শরৎসুন্দরী। সে কথা আর বলো না দিদি—একদিন কি আর আমার মাথার ঠিক ছিল—ছেলে নিয়েই ব্যস্ত ত অন্য কিছু দেখব কি? বৌমাকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ করা দূরে থাকুক, খাছাকে কি আমার ভাল করে খাওয়াতে দাওয়াতে পেরেছি, না আদর যত্ন করতে পেরেছি?

ছোট গিন্নী। তা কি করবে দিদি? বৌ কি আর তা বুঝতে পারছে না। যাহোক ডাগর ডোগরটী ত হয়েছে—"

শরৎসুন্দরী। তাই রক্ষে দিদি, নইলে আমি কি একলা সব দিক সামলাতে পারতুম? অজিতকে আমার দেখা শুন ওষুধ খাওয়ান সবই ত বৌমাই করেছেন। লোকজনকে দিয়ে কি সে সব ঠিক মত হত। বৌমাকে আমার এক বার যে কাজটী করতে বলেছি—তা আর দুবার বলতে হয়নি, আর কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা কেমন!

ছোটগিন্নী। তা দেখতে পাচ্ছি—বৌটী তোমার মনের মতনই হয়েছে—সেটাও একটা বরাতের কথা।

শরৎসুন্দরী। তা নয়? আমার ত রাধাকান্তর সেবার জন্যে ভিটে ছেড়ে একদিন নড়বার যো নেই। অজিত একলা কলকেতায় থাকে। বাছার খাওয়া দাওয়ার ভাবনায় আমার মনটা সেইখানেই পড়ে থাকে। বৌমা কাছে থাকলে সে ভাবনাটা থাকবে না। এখন যেন আমার

ভাঙ্গ—বিপুর বৌ বাসায় থাকে ; বৌ মা সেখানে থাকলে তারও একটা দোসর হয়, আমিও বাঁচি।"

পর দিন মধ্যাহ্নকালে অজিত শয্যার উপর একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় বিপ্রদাসের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা নীলিমা, এক গাছি কাপড়ের তৈয়ারী কৃত্রিম যুঁই ও রমণ ফুলের মালা গলায় পরিয়া এবং হস্তে একটা সুসজ্জিত 'ডলি' পুতুল লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া অজিতকে বলিল, "দাদা বাবু, কেমন মালা পেয়েছি! কেমন পুতুল দেখছ?"

অজিত। বাঃ, বেশ মালা ত—চমৎকার পুতুল! কে দিলে?

নীলিমা—বৌদি দিয়েছে। কেন বল দেখি?

অজিত। কেন?

নীলিমা। তুমি আমাকে তোমার সেই চেহারার ছবি দিয়েছলে—মনে আছে?

ডাক্তারী পাস হইলে সহপাঠী বন্ধুদের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া ফটোগ্রাফ্ তুলাইতে গিয়া, ফটোগ্রাফারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়া অজিত এককও এক ডজন ফটোগ্রাফ্ তুলাইয়াছিল। কলিকাতার বাসায় সেই 'ফটো'গুলি এখানে ওখানে পড়িয়া থাকিত। নীলিমা সেই 'ফটো' এক খানি অজিতের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল; অজিতের সে কথা স্মরণ হইল। সে বলিল, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

ইন্দু।

নীলিমা কহিল,"সেই ছবি খানা আমার পুতুলের বাক্সয় ছিল, দেখেছিলে ত? সেই ছবিখানা বৌদিকে দিয়েছি। চাইলে কি না? তাই এই সব—ফুলের মালা, পুতুল দিয়েছে। আরো কত কি দেবে বলেছে। ছবি নিয়ে কি হবে? তার চেয়ে এ পুতুল কেমন চমৎকার—নয়? না বাপু বোল্‌বনা;—বৌদি ছবির কথা বল্‌তে বারণ করেছে। যাই, পিসিমাকে দেখাইগে যাই!" এই কথা বলিয়া নীলিমা ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দু যখন সাবিত্রীর আদেশে, অন্য দিনের মত, অজিতকে, ডাক্তার যে বলকারক ঔষধ সেবনের ব্যাবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই টনিক্ সেবন করাইতে আসিল, তখন অজিত ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "৬ টার গাড়ীতে যাবার ঠিক হয়েছে বুঝি?" ইন্দু আনত-বদনে উত্তর দিল "হুঁ।" অজিত বলিল, "আমার যেতে যদি ৫।৭ দিন দেরী হয়, সেখানে গিয়ে চিঠি লিখো।" ইন্দু সে কথার কোন উত্তর দিল না দেখিয়া অজিত আরও কি বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু সেই সময়ে গৃহের বাহিরে পরিচারিকার পদ-শব্দ শুনিয়া ইন্দু, অজিতের দিকে একবার মিনতিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া, সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইল। পূর্ব্বকথামত সেইদিনই অপরাহ্নকালে, মূল্যবান বসন-ভূষণে সজ্জিতা করিয়া ইন্দুকে শরৎসুন্দরী কলিকাতায় মাতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অজিতের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সাবিত্রী নিরতিশয় দুর্ভাবনায় ছিলেন। ইন্দু যে দিন অজিতের আরোগ্য-সংবাদ লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সে দিন আর সাবিত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাদের দেশে—বিল্বগ্রামে বিবাহাদি শুভ-কর্ম্মের পর গ্রামের পীঠস্থানে দেবী সর্ব্বমঙ্গলার নিকট পূজা দিবার রীতি আছে। কলিকাতায় থাকাতে সেই রীতি পালন করিবার উপায় নাই, কাজেই সাবিত্রী কন্যা ও জামাতার মঙ্গলের জন্য কালীঘাটে পূজা দিবার মানস করিয়া ছিলেন। তদুপরি অজিতের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একান্তমনে মা কালীকে ডাকিয়া ছিলেন "হে মা কালী, আমার অজিতকে শীগ্‌গির সারিয়ে দাও, তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজো দেবো।" এক্ষণে তিনি, সেই পূজার দ্রব্য সামগ্রী দুই তিন দিন, ধরিয়া গুছাইয়া লইয়া, হরিশ ঠাকুরকে বলিলেন, "কাকা, কাল শনিবার আছে, কালই আমরা কালীঘাটে পূজো দিতে যাব। একখানা গাড়ী ঠিক করে রেখ ত? সেইখানে রেঁধে খাওয়া দাওয়া করে, বিকেলে বাড়ী ফিরব।"

সেই কথা মত সাবিত্রী, তৎপরদিন প্রত্যুষে ইন্দু, হরিশ ঠাকুর ও তাঁহাদের ঠিকা ঝি দামিনীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে যাইলেন।

কালীঘাটের পথ ঘাটের তখনও উন্নতি হয় নাই,—প্রায় পঁচিশ

বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। কালীঘাটে পৌঁছিয়া সালঙ্কারা কন্যার সহিত গাড়ি হইতে অবতরণ করিতেই পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এবং সকলেই তাঁহাদের থাকিবার ও পূজা দিবার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য একবাক্যে আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহাদের হস্ত হইতে আশু নিষ্কৃতি লাভের আশায় সাবিত্রী, তাহাদের মধ্যে যাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্পভাষী বলিয়া বোধ হইল, তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে যাহারা নিরাশ হইল, সেই পাণ্ডাপুঙ্গবদের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা মিষ্টকথায় সাবিত্রীকে "মা জননী, মা জননী" বলিয়া এতক্ষণ তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিল. সে বলিল "যাওনা ওর সঙ্গে, টেরটা পাবে এখন! বেটা আসল গাঁটকাটা দাগী, চোরের যাশু।" সেই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত তথাকথিত অল্পভাষী পাণ্ডা তাহার কটীদেশে গামছা বাঁধিয়া, হুঙ্কার দিয়া কহিল, "তবে রে পাজী বেটা, আমি গাঁটকাটা, আর তুমি ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্টির! আজ তুই আছিস্ কি আমি আছি, খুনোখুনি করব।" তাহাদের মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া সাবিত্রী অন্য একজন পাণ্ডাকে বলিলেন, "এস বাবা তুমি এস, আমাদের এখান থেকে নিয়ে চল।" সেই কথা শুনিয়া শেষোক্ত পাণ্ডা বলিল, "এস মা এস, তোমরা এদিকে এস।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া অদূরেই একখানি খড়ের

ছাউনি দোকান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—সম্মুখে পূজার সন্দেশাদির—ডালার দোকান, পশ্চাতে যাত্রী থাকিবার সারি সারি ঘর। এদিকে শিকার পলাইয়া যাইতেই পূর্ব্বোক্ত যুযুৎসু পাণ্ডা রণে ভঙ্গ দিয়া সেই দোকান ঘরের সম্মুখে আসিয়া শেষে নিযুক্ত পাণ্ডার সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু শেষোক্ত পাণ্ডার পক্ষ লইয়া ডালাওয়ালা দোকানদার ঝাঁপের বাঁশ বাহির করিয়া "আয় এগিয়ে আয়, তোকে আজ কুকুর মারা করব," বলিয়া তাড়া করিতেই সে দ্রুতপদে পলাইয়া গিয়া অন্য যাত্রী শিকারের সন্ধানে সচেষ্ট হইল।

তীর্থস্থানে মনের শান্তির জন্য পূজা দিতে আসিয়া পাণ্ডাদের ব্যবহার দর্শনে সাবিত্রী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহার নির্ব্বাচিত পাণ্ডা বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন্ মা? ভিতরে চলুন, কাপড় চোপড় রেখে গঙ্গাস্নানটা করে নিন্। কোন চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক ঠাক্ করে দিচ্ছি। কি রকম পূজা দেবেন তা বলুন, আমি বন্দোবস্ত করি?"

সাবিত্রী বলিলেন তিনি যোড়শোপচারে পূজা দিবেন। সে কথা শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, খদির-বর্ণ দন্তগুলি বিকশিত করিয়া, পাণ্ডা বলিল, "বেশ্ বেশ্ আমি, এখনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; দেখে নেবেন, আমি মায়ের পূজোর আর দর্শনের এমন

সুবন্দোবস্ত করে দেবো, আমি জাঁক করে বলতে পারি, আর কোন * * পাণ্ডার সাধ্যি নেই যে তেমন করে।"

পাণ্ডা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যাত্রীদের জিনিষ পত্র বহিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, হরিশঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া পূজার বন্দোবস্ত করিতে সম্মুখের ডালাওয়ালার দোকানে লইয়া গেল। ডালাওয়ালার সহিত প্রকাশ্যভাবে বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব হইল না; কারণ বন্দোবস্তের হার নির্দ্দিষ্টই ছিল:—প্রতি ষোল আনার ডালায়, পাণ্ডার লাভ পাঁচ আনা, মায়ের পূজার পালাদার হালদারের পাঁচ আনা, ডালাওয়ালা দোকানদারের জিনিষের মূল্য ছাড়া দুই আনা; সুতরাং একটাকা দিলে ডালাদার চারি আনার জিনিস দেয়। তাহা হইতে পূজার পালাদার ব্রাহ্মণেরা পূজাদাতাকে এক আনার প্রসাদ ফেরত দেয়। এক্ষেত্রে সেইরূপ-হারেই বন্দোবস্ত হইল; অবশ্য হরিশঠাকুর সে কথা জানিতে পারিল না,—মনে করিল সাবিত্রী যে কয়টা টাকা দিয়াছিলেন সমস্তই পূজার ডালা খরিদ করিতে ব্যয় হইয়া গেল।

আদিগঙ্গায় স্নানান্তে সাবিত্রী নিজে, ও ইন্দুকে দিয়া, পথের উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট কাঙ্গালীদের পয়সা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে ঠিকা ঝি দামিনী বলিল, "দেখ গো মা, এদিকে দেখ, যে লোকটা আমাদের গাড়ির পেছনে পেছনে আধকোশ পথ ছুটে এল, সে এখন কি

রকম ঢং ক'রে বসেছে দেখ!" সাবিত্রী দেখিলেন "সত্যই সেই সবলকায় ও ক্ষিপ্রগতি ভিক্ষুক এক্ষণে পদদ্বয়ে ছিন্নবস্ত্র বাঁধিয়া তারস্বরে, করুণ-সুরে হাঁকিতেছে, "দোহাই মা ঠাকরুণ, এই খোঁড়া নেংড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান্ মা ঠাকরুণ। মা কালী আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর্‌বেন মা ঠাকরুণ।" সাবিত্রী সেই ধূর্ত্তকেও বঞ্চিত করিলেন না, তাহাকে একটি পয়সা দিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সেই সময়ে ইন্দুর কাছে একজন শীর্ণকায় ভিক্ষুক আসিয়া বলিল "মা রাজরাণী, গরিব বামুনকে কিছু খেতে দাও মা. আজ তিন দিন অভুক্ত, এই দেখ মা অন্নাভাবে সন্তানের কি দশা হয়েছে দেখ মা জননী" এই কথা বলিয়া সে তাহার উদর সঙ্কুচিত করিয়া এরূপ এক গভীর গহ্বরের সৃষ্টি করিল, যে বোধ হইল যেন তাহার উদরের অভ্যন্তর একেবারেই শূন্য—যেন অন্ত্র অবধি হজম হইয়া গিয়াছে। ইন্দু বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে ভিক্ষুকের সেইকাণ্ড. দেখিতেছিল; তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ইন্দু স্থির করিতে পারিল না, যে সে যথার্থই ক্ষুধার্ত্ত কি ঐন্দ্রজালিক। ইন্দু তাহাকে একটি পয়সা দিতে গেল, কিন্তু ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিল, "একটা পয়সায় কি হবে মা! এক পয়সায় কি এ জঠর জ্বালা মেটে?" ইন্দুর হস্তের পয়সাগুলি সমস্তই বিতরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে সাবিত্রীর নিকট হইতে আর কিছু পয়সা পাইবার মানসে অগ্রসর

হইতেই ভিক্ষুক মনে করিল, ইন্দু বুঝি তাহার কথা শুনিল না. তাহাকে একেবারেই বঞ্চিত করিল; চকিতে তাহার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার দেহ ব্রহ্মণ্যতেজে কাঁপিয়া উঠিল. সে বলিল—"কি—দিলি নি! এই পৈতে ছিঁড়লাম্, তাহলে, একেবারে উচ্ছন্ন যাবি, গয়না পরার গরব বেরিয়ে যাবে, এই আমার মত হাত হবে!" ইন্দু ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে সাবিত্রীকে ডাকিল "মা,—অ মা, এদিকে এস না?" সাবিত্রী অগ্রসর হইয়া একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দুর কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সাবিত্রীকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া প্রস্থান করিল। সাবিত্রী তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। দামিনী ইন্দুর পশ্চাতে ছিল, সেও ভিক্ষুকের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহাকে ডাকিল, "অ বামুন—বামুন!" কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না,—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। সাবিত্রী তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার দেখা পাইলেন না।

কালীদর্শন ও নকুলেশ্বর দর্শন করিয়া এবং উভয় স্থানেই পূজা দিয়া তাঁহাদের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। বাসায় আসিয়া সাবিত্রী রন্ধনের আয়োজন করিলেন এবং ইন্দু ও দামিনী তাঁহার সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে ব্যাপৃত

রহিল। হরিশঠাকুর সেই সময়ে একবার হুঁকা হস্তে বাসা-বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ডালাদার ব্রাহ্মণের দোকানে বসিয়া তামাকু সেবন করিবার অবসর পাইল। হরিশ আপন মনে মিঠাইয়া মিঠাইয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছে, এমন সময় সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, যে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ইন্দুকে অভিসম্পাৎ দিয়া সাবিত্রীকে দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সে গলায় একখানি উড়ানী ঝুলাইয়া এবং চটী জুতা পরিয়া এক নবমূর্ত্তিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং হরিশের নিকটে আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা কলকেটা একবার দিন্ না, দু'টান টেনে যাই।" হরিশ তাহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই—সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার হস্তে কলিকাটী দিল। ব্রাহ্মণ হরিশের নিকট বসিল এবং হস্তদ্বারা হুঁকার সৃষ্টি করিয়া কলিকাটীতে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়দের থাকা হয় কোথায়?" হরিশ বলিল, "আমাদের নিবাস বিল্বগ্রামে—এখানে বাদুড়বাগানে বাসা।

ব্রাহ্মণ। বাদুড় বাগানের সরকারী ডাক্তারখানার কাছে বুঝি?

হরিশ। হ্যাঁ সেইখানেই—গলির ভেতর।

ব্রাহ্মণ। রাস্তার ওধারের গলিটায় বুঝি? সেখানে যে, আমাদের দেশের একজন লোক থাকে। এখানে মা কালীর পূজো দিতে এসেছেন? সঙ্গে মেয়ে ছেলেরা আছেন না?

হরিশ। হ্যাঁ ভাইঝি আছেন, তাঁর মেয়ের কল্যাণেই পূজো মানা ছিল।

ব্রাহ্মণ। ওঃ, সেই গয়না টয়না পরা মেয়েটি বুঝি? দিব্যি মেয়েটি—কি ছেলে পুলে?

হরিশ। ছেলে পুলে হয়-নি, এই সবে বিয়ে হয়েছে—ওর বিয়ের কল্যাণেই পূজো দিতে আসা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। তা বেশ; বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে দেখছি—অনেক অলঙ্কার পত্র দিয়েছে।

হরিশ। হ্যাঁ শ্বশুর দুর্গাপুরের জমিদার, আমীর লোক, নাতজামাইও ডাক্তার—হীরের টুক্‌রো ছেলে।

ব্রাহ্মণ। বেশ—বেশ কোথায় ডাক্তারী করেন?

হরিশ। ঐ বাদুড়বাগানেই; আমাদের বাড়ির সুমুখেই তাঁর বাসা—মা দেশেই থাকেন, তাই এখানে আর বাড়ী করেন নি।

ব্রাহ্মণ। নাত জামাইয়ের তাহলে বাপ নেই?—নামটি কি?

হরিশ। শ্রীমান্ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—এম. বি।

ব্রাহ্মণ। বেশ বেশ, তাহলে আপনাদেরও খরচ পত্র করতে হয়েছে খুব বোধ হয়; যে দিন কাল পড়েছে।

হরিশ। না, সে সব ওঁরা কিছু চাননি; নাতনীর শ্বাশুড়ী

দেনা পাওনার কোন কথাই বলেন নি—নাতজামাই নিজে দেখেই পছন্দ করে বলে পাঠান, তাতেই বিয়ে হয়ে গেছে। ওঁরা বনেদি বড়লোক ; বাড়ীতে বিগ্রহ আছে, দোল দুর্গোৎসব—বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে, তাইত নাতজামাইয়ের মা ভিটে ছেড়ে এসে ছেলের কাছে থাকতে পারেন না। তবে আমার ভাইঝিও, মেয়ে জামাইকে, আপনার ইচ্ছাতেই, দিতে কসুর করেন নি, যতদূর সাধ্য খরচ করেছেন ; একটি মেয়ে বই আর ত কেউ নেই, আর অমন রাজার মত জামাই হ'ল।

ব্রাহ্মণ। শুনে খুব সুখী হলুম—মশায়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম, মশায়ের নামটি কি বল্লেন ?

হরিশ। শ্রীহরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ। বাড়ীর নম্বরটা বল্লেন বুঝি ২৩—নয় ?

হরিশ। না ৬এর নম্বর।

ব্রাহ্মণ। ওখানে আপনারা বুঝি অল্পদিন আছেন।

হরিশ। না, ১০।১১ বছর হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ। আমাদের দেশের লোকটীর সঙ্গে দেখা করতে আমি মধ্যে মধ্যে ওদিকে যাই, কি না ? মশায়কে ওদিকে দেখিনি, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। এইবার ওদিকে গেলেই মশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।

হরিশ। বেশ ত, যাবেন না; এখন তাহ'লে উঠলাম,—রান্নাবান্নার কতদূর কি হল দেখিগে।

ব্রাহ্মণ কহিল, "আচ্ছা আমিও আসি—নমস্কার।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল। আহারাদি করিয়া বাটীতে ফিরিতে সেদিন সাবিত্রীদের সন্ধ্যা হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্নকালে ইন্দু ছাদের উপর তাহার ফুল-গাছগুলির টবে জল দিতে উঠিয়া দেখিল, তাহার রাইবেলের গাছের যে কুঁড়িটী অনেকদিন ধরিয়া ক্রমশঃ বড় হইতেছিল সেটী স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, সেইদিনই সন্ধ্যার পর ফুটিবে। পূর্ব্বে নূতন কোনও গাছে গোলাপ বা অন্য কোনও ভাল ফুল ফুটিলে, সে কখনও কখনও তাহা তুলিয়া খোঁপায় পরিত। কিন্তু সেদিন সেই বিকশিত-প্রায় সুবৃহৎ রাইবেলটী দেখিয়া, ইন্দুর সেটীকে তুলিয়া কবরীর শোভাবর্দ্ধন করিবার সাধ হইল না, তাহার নয়ন স্বতঃই সম্মুখস্থ অজিতের রুদ্ধ-বাতায়ন কক্ষের দিকে ধাবিত হইল। তাহার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। তাহার মনে পড়িল অজিত তাহাকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিল, কিন্তু পাছে শ্বশ্রূঠাকুরাণী বা অপর কোন গুরুজন নববধূর সেরূপ আচরণ দেখিয়া কিছু মনে করেন, সেই লজ্জায় ইন্দু, অজিতের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই। সে ভাবিল তাহাতে কি অজিত তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে? না—তাহা হইতে পারে না—তিনি ত আর অবুঝ নহেন।

আর দুই চারি দিন পরেই অজিত আসিবে, তাহা হইলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। এ কয়টা দিন কোনও রূপে কাটাইতে পারিলে হয়। অজিতের কক্ষের সম্মুখের ছাদের প্রাচীরের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘন-সন্নিবিষ্ট গোলাপ গাছের বড় বড় টব গুলির গাত্রে অস্তগামী তপনের স্বর্ণরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল; ইন্দু উৎসুক নয়নে সেই দিকে চাহিয়া উপরোক্ত কথা এবং আ'ও কত কথা ভাবিতেছিল;—এখন অজিত কি করিতেছে? এতদিনে হয়ত অজিত শরীরে বল পাইয়াছে, এবং দুর্গাপুরে তাহাদের বাটীর নিকটেই ক্ষীণকায়া নদীর ধারে যে বিসর্পিত-গতি সুন্দর পথটী আছে, হয়ত সেই পথে সান্ধ্য-ভ্রমণ করিতে গিয়াছে; অজিত কি এখন তাহার কথা ভাবিতেছে? এইরূপ কত কথাই ইন্দুর মনে প্রভাত-স্বপ্নের মত উদিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল; এমন সময়ে ইন্দু শুনিতে পাইল, কে একজন তাহাদের বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিতেছে—"হরিশ বাবু বাড়ী আছেন কি?" সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ইন্দু ছাদের প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, নিম্নের পথের দিকে চাহিয়া, আগন্তুককে দেখিল এবং দেখিয়াই যুগপৎ ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে বলিল, "দেখ মা—কাল যে ভিখিরী বামুন কালীঘাটে আমাকে পৈতে ছিঁড়ে

শাপ দিতে গিয়েছিল—ঠিক তার মতন একজন লোক এসে দাদামনিকে ডাকছে!"

সাবিত্রী মালা জপিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে আবার কাকার কাছে আসবে কি করতে? আর কে হবে।" এই কথা বলিয়া তিনি হরিশ ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—"কাকা, তোমাকে বাইরে কে ডাকছে গো—দেখে এস ত।"

হরিশ ঠাকুর বাড়ীর ভিতরের ক্ষুদ্র উঠানে একখানি কাঠের চৌকিতে বসিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। অজিত কলিকাতায় না থাকাতে, হরিশ ঠাকুরের মনেও সেই নবীন সঙ্গীটির অভাবে যেন একটা অবসাদ আসিয়াছিল। কৃত্তিবাসের সাহচর্য্যে হরিশ মনের সেই অবসাদ দুর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল, "আমাকে আবার ডাকবে কে? কৈ দেখি।" এই কথা বলিয়া হরিশ ঠাকুর বাহিরে গিয়া সদর দ্বারের অর্গল মুক্ত করিতেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ বিনাবাক্যব্যয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে বেশে সে হরিশ ঠাকুরের সহিত আলাপ করিয়াছিল, আজ তাহার সেই বেশ—নগ্নগাত্র, গলায় চাদর ও পায়ে ধূলি-সমাচ্ছন্ন চটী। বাটীতে প্রবেশ করিয়া সে হরিশ ঠাকুরকে নিতান্ত পরিচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে, মশায়—আছেন কেমন?"

হরিশ ঠাকুর এত শীঘ্রই কালীঘাটের সেই নব-পরিচিত বন্ধুটীর সাক্ষাৎ পাইবার প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু বিস্মিত স্বরে বলিল, "মশাই বুঝি দেশের সেই লোকটীর সঙ্গে দেখা করতে এদিকে এসেছেন ?"

আগন্তুক সস্মিত বদনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ গো—তিনি যে এই বাড়িতেই থাকেন।"

হরিশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "সে কি ! এ বাড়ীতে ? আপনাদের দেশ কোথায় ?"

আগন্তুক স্থিরভাবে উত্তর দিল, "রামকানাইপুর। আমার নাম ঘনশ্যাম—আমি আপনার ভাইঝির দেওর হই—তাঁকে ডাকুন না একবার।"

হরিশ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কৈ—সে কথা ত কাল কিছু বলেন নি ?"

ঘনশ্যাম কহিল, "সব কথা কি একেবারে ভাঙ্গলে চলে কর্ত্তা—সবুরে মেওয়া ফলে—বৌ ঠাকরুণকে ডাকুন না ?"

হরিশঠাকুর আগন্তুকের ভাবগতিক কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে সন্দিহান-মনে সাবিত্রীকে গিয়া বলিল, "তোমার যে দেওর হয় বলছে গো ! একবার দেখে যাও দেখি।" হরিশ ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই আগন্তুক বিনা আহ্বানে স্বয়ং সেখানে আসিয়া সশরীরে হাজির হইল এবং একটা

হাস্যের অভিনয় করিয়া বলিল, "কিগো বৌ ঠাকরুণ—চিন্‌তে পার?"

ইন্দু, সাবিত্রীর পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিল। আগন্তুককে নিকট-দৃষ্টিতে দেখিবা মাত্র ইন্দুর মনে যে সামান্য সন্দেহ ছিল তাহা বিদূরিত হইল; সে চিনিতে পারিল যে ব্রাহ্মণ আর কেহ নহে—যে পূর্ব্বদিন কালীঘাটে তাহাকে অন্ত্র-শূন্যপ্রায় উদরের গহ্বর দেখাইয়া বুভুক্ষিতের ভাণ করিয়াছিল, এ সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। এক্ষণে তাহার মুখে হাস্য এরূপ বীভৎস দেখাইল যে ইন্দু ত্রস্তভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে সাবিত্রীও আগন্তুককে দেখিয়া, পথের মধ্যে সহসা ঊর্দ্ধ-ফণা বিষধর দেখিলে লোকে যেরূপ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ বিভীষিকায় বিবর্ণ ও নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কেবল "হুঁ" বলিয়া, তাহাকে যে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাই জানাইলেন।

ঘনশ্যাম পূর্ব্ববৎ ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, "বলি, গরিব দেওরকে কি একেবারে ভুলে গেলে গা? শুনছি বড় ঘরে কুটুম্ব করেছ—মেয়ের শুনছি নাকি আবার—"

সাবিত্রী বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি চাও কি? এখানে এসেছ—কি করতে?"

শিকারী বিড়াল যেরূপ করতলগত মূষিককে লইয়া ক্রীড়া করে সেইরূপ ভাবে ঘনশ্যাম ধীরে ধীরে বলিল, "এত দিনের পর দেখা পাওয়া গেল—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আপনার জনকে কি এই রকম করে খাতির যত্ন করে?"

সাবিত্রী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "তোমাকে জানা আছে ত—কি মতলবে এসেছ—সেইটা স্পষ্ট করে বল।"

ঘনশ্যাম চিবাইয়া চিবাইয়া উত্তর দিল, "কথাটা একটু আড়ালে বল্‌লে হয় না?"

সাবিত্রীর মনের বল ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থির ভাবে হরিশঠাকুরকে বলিলেন—"কাকা, একটু আড়ালে যাও ত—কি বল্‌তে চায় শুনি।" হরিশ ঠাকুর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। সাবিত্রীর কথা শুনিয়া হরিশ ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে বাহিরে সদর দ্বারের কাছে গেল। হরিশ বাহিরে যাইতেই সাবিত্রী পুনরায় ঘনশ্যামকে বলিলেন, "কি বল্‌তে এসেছ—বল?"

ঘনশ্যাম। বলছি গো—একটু ঠাণ্ডা হওনা—অমন করে চল্‌তি রেল্ গাড়ীতে চড়ে দাঁড়ালে কি আর কথা হয়? বেশ্ ত মজায় রাজার হালে আছ দেখ্‌ছি—ডাক্তার জামাই করেছ—জমিদার-গিন্নী বেয়ান হয়েছে—তোমার ত এখন পোয়াবারো। তা গরিব দেওরের একটা বিহিত কর।

সাবিত্রী। আমি আবার তোমার বিহিত করব কি? বিধবা মানুষ—বাবা কিছু রেখে গেছেন, তাই দুমুঠো খাচ্ছি—মেয়েটাকে মানুষ করতে পেরেছি। নইলে ত আমাকে ভেসে বেড়াতে হ'ত—পরের দোরে ভিক্ষে করতে হ'ত। তোমাদের দেশ থেকে এক কাপড়ে চলে এসেছিলুম. তার কি খোঁজ রাখনা?

ঘনশ্যাম। খোঁজ সবই রাখি বৌ-ঠাকরুণ—নইলে কি আর এসেছি? ত্রিপুরা দাদা কিছু রেখে জান নি, তা জানি, কিন্তু তোমার বাপ ত বেশ দুপয়সা রেখে গিয়েছেন শুনেছি। তা তুমি এমনি সরে পড়েছিলে যে তোমার কোনও সন্ধানই করতে পারিনি। যা'হোক মা কালীর দোর ধরে ছিলুম—মা কালীই সন্ধান করিয়ে দিয়েছেন! তোমার মত, জমিদারণীর বেয়ান, ডাক্তার জামাইয়ের শাশুড়ী বিদ্যমান থাকতে কি আমার কালীঘাটে কাঙ্গালী-বৃত্তি করা আর ভাল দেখায়? আমার বিহিত না করলে আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।

সাবিত্রী তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বলিলেন. "দু পাঁচ টাকা চাও ত দিতে পারি, নিয়ে যাও।"

ঘনশ্যাম পূর্ব্ববৎ বিকট হাস্যের অভিনয় করিয়া বলিল, "দু পাঁচ শ'য়ের কথা কও, দু পাঁচ টাকা কি? আমাকে কি আটাশে ছেলে পেয়েছ বৌঠাকরুণ;—ঘনশ্যামকে কি চেন না?"

সাবিত্রী। চিনি খুব, কিন্তু অত টাকা আমি পা'ব কোথায়? তোমাকে যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে কি আমাকে পথে বস্‌তে বল না কি?

ঘনশ্যাম। পথে বস্‌বে না বৌঠাকরুণ—তা আমি বেশ জানি। গোয়ালার দুধের দাম যতই কাট না—দুধে হাত পড়ে না—জলের ওপর দিয়েই যায়। তুমি কত টাকার মালিক—তা তোমাদের গ্রামে গিয়ে জেনে আসিনি কি মনে করেছ? গয়না পত্তরে আর নগদে তুমি টাকার আণ্ডিল নিয়ে বসে আছ।

সাবিত্রী। গাঁয়ের লোকেরা অমন বাড়িয়ে বলে থাকে। যা এনেছি—তাতে কোন রকমে দুমুঠো করে খাচ্ছি; আর আজ দশ বছর ধরে সেই টাকাই ভেঙ্গে ত খরচ করে আসছি; মেয়ের বিয়েতে খরচ হয়নি? সে টাকার—আর আছে কি?"

ঘনশ্যাম। ও সব বাজে কাঁদুনী আমি শুনছি না—পাঁচশ খানি টাকা গুণে না নিয়ে আমি এখান থেকে উঠ্‌ছি না। দু পাঁচ টাকার জন্যে কি আর তোমার কাছে এসেছি? কালীর দোর ধরে আছি—যে দিন দুটো টাকা রোজগার না করি, সে দিন তুমি আমায় বাপন্ত করে গাল দিও। কালীঘাটের কাঙ্গালী বামুনের ব্যবসাটা ভালো, কিন্তু

আর ও কাজ ভাল লাগছে না, এবার আবার দেশে গিয়ে বস্‌ব মনে করেছি—তাই তোমার কাছে এসেছি।

সাবিত্রী। দেশে যাবে তা যাওনা—আমি না হয় রাহা খরচটাও দিয়ে দিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। বলেছি ত, পাঁচশ টাকার এক পয়সা কমে সে কাজ হবে না। চক্রবর্ত্তীদের ধেনো জমিটা শুনেছি বাকি খাজনার দায়ে নীলামে উঠবে; সেটাকে কিনে নিতেই তিন শ' টাকা পড়ে যাবে—নইলে দেশে গিয়ে পেট চালাবো কি করে? ঘরের চাল গুলোও ভেঙ্গে পড়ে গেছে, সেগুলোও মেরামত করতে শ খানেক টাকার কমে হবে না। খেঁদীর বিয়েতেও কোন না শ খানেক যাবে। এই পাঁচ শ টাকা ত চাই—ই—

সাবিত্রী। আমি অত টাকা কি ঘরে নিয়ে বসে আছি? যা কিছু আছে, সুদে খাটিয়ে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছি।

ঘনশ্যাম। আচ্ছা নগদ না পার, গয়না পত্তরে যে রকমে পার দাও—তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

সাবিত্রী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আজ যাও, ভেবে দেখি, তার পর জোগাড় করে যা পারি দেবো।"

ঘনশ্যাম। দেখো, আমার সঙ্গে ন্যাজে খেলো না, তা হলেই নিজমূর্ত্তি ধর'ব—জামাই বাড়ী গিয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো।

সাবিত্রী। তাতে তোমার লাভটা হবে কি—তারা কি তোমায় টাকা দেবে?

ঘনশ্যাম। তা না দি'ক্—তোমার মেয়ের ত শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার দফা রফা হ'য়ে যাবে?

সাবিত্রী। কেন, আমার মেয়ের দোষটা হ'ল কি? জামাই আমার তেমন ছেলে নয়—যে তোমাদের মত লোকের লাগানি ভাঙ্গানিতে কাণ দেবে?

ঘনশ্যাম। আচ্ছা আমার কথা না শোনে—যার কথা পিয়াদায় শোনাবে—সেই দিগম্বর গাঙ্গুলীকে এনে হাজির করব?

সাবিত্রী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে দিগম্বর গাঙ্গুলী? আমি তাকে চক্ষেও দেখিনি—তাকে চিনিনি—জানিনি।"

ঘনশ্যাম। তুমি না চেনো, আমি ত জানি—আমি ত সে বিয়ের সাক্ষী আছি।

সাবিত্রী অধিকতর উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন, "কিসের বিয়ে—কার বিয়ে? দুধের মেয়েকে নিয়ে তোমাদের দেশ থেকে চলে এসেছি—কে তোমার কথা বিশ্বাস করবে? জামাই আমার লেখাপড়া শিখেছে—

ঘনশ্যাম। জামাই না বিশ্বাস করে—তার মা করবে—তার জ্ঞাতিরা করবে—তার গাঁয়ের লোকেরা করবে। তাতেও যদি তোমার মেয়েকে ত্যাগ না করে, তা' হলে আদালত আছে—দিগম্বর বুড়োকে এনে ফৌজদারী জুড়ে দিয়ে, বাছাধনের পরের বৌ নিয়ে ঘর করা গুঁতোর চোটে বের করে দেবো; দেখি তুমি মেয়ের দু দুটো বিয়ে দিয়ে কেমন করে পার পেয়ে যাও।

সেই সময়ে শঙ্কিত কণ্ঠের একটা অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া সাবিত্রী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন ইন্দু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে যে ঘরের ভিতর হইতে আবার কখন বাহিরে আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, উত্তেজনাবশতঃ সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এখন ইন্দুকে কাঁপিতে দেখিয়া সাবিত্রী ত্রস্তভাবে তাহাকে ধরিতে গেলেন। কিন্তু তাহার দেহ স্পর্শ করিতে না করিতে সে সশব্দে বিগতচেতনা হইয়া পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে সাবিত্রী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, "কাকা শীগ্‌গির এস গো, ইন্দুর আমার কি হলো গো—কোথা থেকে এ আপদ এসে জুটলো গো!"

সাবিত্রীর ক্রন্দন শুনিয়া হরিশ ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া—"কি হয়েছে" বলিয়া বাটীর ভিতরে ছুটিয়া আসিল। সদর বাটীর

কাছে দাঁড়াইয়া অজিতের পরিচারক গুরুচরণ, হরিশ ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছিল; সাবিত্রীর কাতর কণ্ঠধ্বনি সেও শুনিতে পাইয়াছিল—হরিশ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীর ঠিকা ঝি দামিনীও সেই সময়ে তাহার বৈকালের বাসন মাজা ও অন্যান্য গৃহ-কর্ম্ম সারিতে আসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া ইন্দুর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। সাবিত্রী, ইন্দুর মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, তাহার চোখে ও মুখে জল সেচন করিতে লাগিলেন—দামিনী ব্যজন করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম একটু সরিয়া গিয়া, বহির্বাটী হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারের নিকট, দাঁড়াইয়াছিল।

গুরুচরণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?"

দামিনী কিয়ৎক্ষণ ঘনশ্যামের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা! ওকে যে কাল কালীঘাটে দেখেছি! ওইত কাল পেটের খোল আঁতে করতালে ফেলে দিদিমণিকে ভয় দেখিয়ে শেষে শাপ মন্দ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ও আবার এখানে এসে জুটলো কি করে ? আবার চাদর গলায় দিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে ভদ্দর লোক সেজেছেন!—মরণ আর কি ? ও এখানে কোথা থেকে এল ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "কোথা থেকে এসেছে তা ও-ই জানে, মেয়েটাকে বুঝি একেবারে মেরে ফেল্লেরে! যা বাবা গুরুচরণ, চট্‌করে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, শেষে কি মেয়েটা মারা যাবে।

গুরুচরণ সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের অনুসন্ধানে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। এদিকে জল সেচন ও ব্যজন করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ইন্দুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—সে চক্ষু উন্মীলন করিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্যহীন চাহনীতে তখনও একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়া ছিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন তাহার জ্ঞান হইয়াছে—তিনি উত্তেজনা দমন করিবার জন্য একটী ঔষধ লিখিয়া দিয়া এবং যাহাতে পীড়িতার কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা না হয়—সে শান্তিতে ঘুমাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার দর্শনী লইয়া প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী, দামিনীর সাহায্যে ইন্দুকে তুলিয়া গৃহের মধ্যে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন এবং গুরুচরণকে ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন। হরিশঠাকুর ইন্দুর অবস্থা দেখিয়া এবং আগন্তুকের ব্যবহার ও সাবিত্রীর সঙ্কোচভাব ও মলিন বদন লক্ষ্য করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দুর জ্ঞান হইতেই হরিশঠাকুর যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং সদর দ্বারের কাছে গিয়া, সেইখানে বসিয়া

তামাকু সেবন করিতে লাগিল। দাসিনী তাহার কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেই, ইন্দু যে কক্ষে শয়ন করিয়া ছিল, সেই কক্ষের দ্বারে ঘনশ্যাম ধীরে ধীরে আসিয়া কহিল, "আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌বে? মেয়ে ত ভাল হয়েছে, এই বার আমাকে যা দেবার দাও—আমি চলে যাই।"

ঘনশ্যামকে দেখিয়া সাবিত্রীর পুনর্ব্বার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বলিলেন, "মেয়েটাকে ত মেরে ফেল্‌তে বসেছিলে। যাও এখন যাও, আমাকে আর জ্বালিও না।"

ঘনশ্যাম বলিল, "কে জান্‌ত, তোমার মেয়ে এসে আমাদের কথা শুন্‌বে? আমি টাকা না নিয়ে যাচ্ছি না—না দিলে আজই হাড়াই ডোমাই করে যাবো।"

ইন্দু তন্দ্রালস ভাবে শুইয়া ছিল। পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়—আবার ফিট্ হয়, এই আশঙ্কায় সাবিত্রী দ্বারের কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "শুন্‌লে ত, টাকা যা আছে সুদে খাটছে, এখন যাও, আর একদিন এসো।"

ঘনশ্যামকে সে কথায় কর্ণপাত করিতে না দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আচ্ছা দাঁড়াও যা আছে দিচ্ছি" এই কথা বলিয়া সাবিত্রী বাক্স হইতে ইন্দুর শৈশবকালের কয়েক খানা গহনা ও শতাধিক টাকা ও নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যাও, এতে দুশ টাকার বেশী

হবে, বাকি টাকা এর পরে এসে নিয়ে যেও। কিন্তু যদি এই কথা নিয়ে গোল কর, তা হ'লে আর এক পয়সাও দেবো না।"
ঘনশ্যাম দন্তপাটি বিকাশিত করিয়া বলিল, "রাধামাধব! এ কথার টুঁ শব্দ যদি আমার মুখ থেকে বেরোয় ত আমার নাক কেটে দিও। কিন্তু আমি কালই এমনি সময় আসবো, দেরী করতে পারছিনা, নইলে চক্রবর্ত্তীদের জমিটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। চুপি চুপি কাল টাকা কটা ফেলে দিলেই আমি দেশে চলে যাবো; তুমি মনের সাধে মেয়ে জামাই নিয়ে স্বচ্ছন্দে সাধ আহ্লাদ করো। আর কোন্ * * তোমার দরজা মাড়াবে।"
এই কথা বলিতে বলিতে ঘনশ্যাম সেই গহনা, নোট ও টাকা গুলি উত্তরীয় বস্ত্রে ধীরে ধীরে বাঁধিয়া লইল। সেই সময়ে গুরুচরণ ঔষধের শিশি লইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম আর কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিল।

ইন্দুকে একমাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া সাবিত্রী তাহার কাছে বসিয়া রহিলেন। হরিশঠাকুর, ঠিক যে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সাবিত্রী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া হরিশকে কোনও কথা বলিলেন না বলিয়া হরিশও সে বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তিন ঘণ্টা পরে ইন্দুকে পুনরায় ঔষধ সেবন করাইতে যাইলে ইন্দু বলিল, "না,

আর ওষুধ দরকার নেই। সাবিত্রী বলিলেন, "আর এক দাগ খাওনা?" ইন্দু দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।" সাবিত্রী দেখিলেন কাল-বৈশাখীর তুমুল ঝড় উঠিবার আগে দিঙ্‌মণ্ডল যেরূপ গুমোট্ হইয়া থাকে ইন্দুর সেই রূপ ভাব। তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। নীরবে ইন্দুর কাছে শয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রিতে সাবিত্রীর নিদ্রা হইল না। সুকিয়া ষ্ট্রীটের গাড়ির শব্দ এবং তাঁহাদের বাটীর সম্মুখের গলিতে পথিকের পদশব্দ ক্রমশঃ বিরল হইতে বিরলতর হইয়া শেষে একেবারে থামিয়া গেল। জনকোলাহলময়ী রাজধানী নিস্তব্ধ হইল। সাবিত্রীর মনে হইল সে রজনীতে সকলেই সুপ্তিমগ্ন কেবল তিনিই একাকিনী বুঝি জাগ্রতা; তাঁহার মত দুর্ভাবনা আর কাহার আছে! তাঁহার মত বিষম সমস্যায় আর কে পড়িয়াছে? দ্বিপ্রহরের সময় পাহারওয়ালা আসিয়া তাঁহাদের জানালার কাছ দিয়া হাঁকিয়া গেল। তিনি তখনও বিনিদ্র-নয়নে পূর্ব্বকথা ভাবিতেছেন।

সাবিত্রী কুলীন-কন্যা। তাঁহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহু বিবাহ করিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষে সাবিত্রীর জননীকে বিবাহ করিবার পর আর বিবাহ করেন নাই—তাঁহাকে গৃহে আনিয়া সংসারী হইয়া ছিলেন। দশ বৎসর বয়সের সময় সাবিত্রী মাতৃহারা হয়েন, তদবধি পিতাই তাঁহাকে মাতার যত্নে ও পিতার স্নেহে লালন পালন

করেন। তিনি সাবিত্রীকে লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন এবং গৃহ কার্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যেও বিল্বগ্রামের মধ্যে সাবিত্রীর সমতুল্যা আর কেহ নাই—সাবিত্রীর এই রূপ খ্যাতি হইয়াছিল। সাবিত্রীর পিতা শাস্ত্রজ্ঞানী হইয়াও কিন্তু কৌলীন্যের গৌরব বা মোহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বয়স্থা হইলেও সাবিত্রীর বিবাহ হয় নাই। অবশেষে রামকানাইপুরের বিখ্যাত কুলীন ত্রিপুরাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তিনি সাবিত্রীর বিবাহ দেন। সাবিত্রীর পিতার ইচ্ছা ছিল না যে সাবিত্রী স্বামীর ঘর করিতে যান। কারণ ত্রিপুরাচরণ তেত্রিশটি বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং কৌলীন্য ভিন্ন তাঁহার অপর কোনও গুণ ছিল না—তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নেশাখোর ছিলেন। সাবিত্রীর রূপে ও গুণের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া কিন্তু ত্রিপুরা তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া সংসার করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাবিত্রী নিজেই স্বামিগৃহে যাইতে চাহিলেন, অগত্যা সাবিত্রীর পিতা তাঁহার প্রাণতুল্যা কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সাবিত্রীর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাবিত্রীকে গৃহে লইয়া গিয়া ত্রিপুরাচরণ তাঁহার অপর বত্রিশটি শ্বশুরালয় হইতে অর্থ লইয়া আসিবার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া পৌরহিত্য করিয়া কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিলেন। এই রূপে ছয় বর্ষ

কাল তিনি সাবিত্রীকে লইয়া সংসার করিয়া ছিলেন। সেই সময়েই ত্রিপুরাচরণের গৃহে ইন্দু ভূমিষ্ঠা হয়। কন্যা হওয়াতে ত্রিপুরাচরণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েন এবং ভাবী কন্যা-দায়ের দুর্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য পুনরায় নেশার মাত্রা বৃদ্ধি করেন। গাঁজা, গুলি, আফিম, ভাঙ, এই চতুর্বিধ নেশাতেই তিনি পরিপক্ক ছিলেন এবং এইসকল নেশার সঙ্গী ছিল তাঁহার—ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম ত্রিপুরাচরণকে গ্রাম সম্পর্কে দাদা বলিত, নতুবা উভয়ের মধ্যে কোনও শোণিত-সম্বন্ধ ছিল না ; ঘনশ্যামও ব্রাহ্মণ, কিন্তু কুলীন নহে। ইন্দুর বয়স যখন দেড়বর্ষ মাত্র সেই সময়ে রানকানাইপুরে দিগম্বর গাঙ্গুলী নামে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ দশ বৎসরের বালিকা হইতে পঞ্চাশবর্ষ বয়স্কা পর্য্যন্ত এককালীন সাত আটটী কুলীন-কন্যার কুমারী নাম ঘুচাইতে আইসে; দিগম্বর নিজে তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। ঘনশ্যাম সেই সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরাকে পরামর্শ দিল, সেই পাত্রের হস্তে ইন্দুকে সমর্পণ করিলে ত্রিপুরার ভবিষ্যতে কন্যাদায়ের ভাবনা আর থাকিবে না দশ পনর টাকা দিলেই ত্রিপুরা রাজি হইবে ; এ বিবাহটী তাহার বিশ্বগ্রামের অপর বিবাহগুলির সঙ্গে 'ফাউ' বলিয়া ধরিয়া লইবে ; কন্যাপার করিবার এমন সুযোগ ত্রিপুরা আর কখনও পাইবে না, ত্রিপুরা রাজি হইলে ঘনশ্যাম সমস্ত ঠিকঠাক

করিয়া দিল। ত্রিপুরা তাহার অনুজপ্রতিম, এক কল্কিকায় গঞ্জিকা সেবনের ইয়ার ঘনশ্যামের কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, কিন্তু সাবিত্রীকে সে কথা বলাতে সাবিত্রী বলিলেন, তিনি প্রাণ থাকিতে তাঁহার দুধের মেয়ের জীবনটাকে কিছুতেই সেইরূপে বৃথা করিতে দিবেন না। সাবিত্রী প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতেন, এবং তাঁহাকে নেশা ত্যাগ করাইয়া সৎপথে আনিতে সাধ্যমত চেষ্টাও করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সাবিত্রীর রূপের মোহে এবং সেবায় ও স্বার্থত্যাগে তুষ্ট হইয়া ত্রিপুরা তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সারাজীবনের অভ্যাসে ও ঘনশ্যামের সঙ্গদোষে শেষে ত্রিপুরা পুনরায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল; সে আর সাবিত্রীর কোন কথাই শুনিত না। এক্ষণে ইন্দুর বিবাহের এই প্রস্তাব লইয়া সাবিত্রীর সহিত ত্রিপুরার মতান্তর—মনান্তর হইল; ত্রিপুরা সাবিত্রীকে কটুকথা বলিল। সাবিত্রী স্ত্রীলোকের শেষ অস্ত্র—ক্রন্দনের আশ্রয় লইলেন এবং শেষে ভাবিলেন বুঝি তাঁহারই জয় হইল। কিন্তু সাবিত্রী জানিতেন না যে ঘনশ্যামের পরামর্শে ত্রিপুরা তাঁহাকে পরাজিত করিবার আর এক উপায় অবলম্বন করিবে। একদিন রাত্রিতে সাবিত্রী ইন্দুকে ক্রোড়ের কাছে লইয়া ঘুমাইয়া ছিলেন। হঠাৎ মধ্যরাত্রে, বাহিরে ইন্দুর উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

তিনি চমকিয়া উঠিয়া ক্রোড়ের কাছে হাত দিয়া দেখেন ইন্দু সেখানে নাই। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখেন তাঁহার স্বামী একটী লণ্ঠন হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছে এবং পশ্চাতে ঘনশ্যাম ইন্দুকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছে; ইন্দু প্রাণপণ চীৎকারে কাঁদিতেছে ও হাত পা ছুড়িতেছে। ইন্দুর অন্নপ্রাশনের সময় সাবিত্রীর পিতা যে চেলীর কাপড়খানি পাঠাইয়া ছিলেন, কে ইন্দুকে সেই কাপড়খানি পরাইয়া দিয়াছে। ঘনশ্যাম গৃহের দাওয়ায় অধীরভাবে ক্রন্দনরতা ইন্দুকে বসাইয়া দিয়া সাবিত্রীকে বলিল, "বৌ-ঠাকুরুণ, এই নাও তোমার মেয়ে; ঘোষালদের বাড়ীতে আজ দুটো মেয়ের সঙ্গে দিগম্বর গাঙ্গুলীর বিয়ে ছিল জানত? সেই সঙ্গে তোমার মেয়েরও বিয়ে দিয়ে এনেছি। এখন কি করবে করো—এখন দাদার সঙ্গে লাঠালাঠিই করো আর কান্নাকাটিই করো বিয়ে ত আর ফিরবে না? কেমন মজা! আমি এখন আসি তাহলে দাদা", এই কথা বলিয়া ঘনশ্যাম হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

সাবিত্রী, ইন্দুর পরিহিত সেই ক্ষুদ্র চেলীর কাপড়খানি তাহার অঙ্গ হইতে খুলিয়া লইয়া নিষ্ফল ক্রোধে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন, তাহার মস্তকের সিন্দুর জলদিয়া ধৌত করিয়া দিলেন শেষে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া ভূমিতে পড়িয়া মর্ম্মন্তুদ

বেদনায় ধরাতল অশ্রুসিক্ত করিতে লাগিলেন। তাহার পরদিন ইন্দুর সেই বিহাহের কোন কথাই সাবিত্রী উত্থাপন করিলেন না। ত্রিপুরাও সাবিত্রীর ভাবগতিক দেখিয়া সে কথার উত্থাপন করিতে সাহস পাইল না। দিগম্বর গাঙ্গুলী সেই দিনই রামকানাইপুর ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। এই ঘটনার ছয় মাস পরেই ত্রিপুরা একদিন অসুস্থ অবস্থায় অধিক পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া কাশিতে কাশিতে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইল। সাবিত্রী তাঁহার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যাটীকে লইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সাবিত্রীর বৃদ্ধ পিতা কন্যাকে নিজগৃহে ফিরিয়া পাইয়া স্বর্গ হাতে পাইলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যার বৈধব্য অতি সাধারণ ঘটনা, সেজন্য সাবিত্রীর পিতা দুঃখিত হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিলেন না; তিনি জরাতুর হইয়া পড়িয়া ছিলেন এসময়ে তাঁহার নয়নপুত্তলি কর্ম্মিষ্ঠা কন্যা গৃহে আসিয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করাতে তিনি সন্তুষ্টই হইলেন। সাবিত্রী পিতৃগৃহে আসিয়া, তাঁহার দুগ্ধপোষ্যা কন্যার যে অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাতে কৌশল করিয়া তাঁহার স্বামী বিবাহ দিয়াছিলেন, সেই বীভৎস ঘটনার কথা প্রকাশ করিলেন না। রামকানাইপুরে থাকিতেও ঘনশ্যামের মুখে সেই রাত্রিতে যে কথা শুনিয়াছিলেন তাহার পর সাবিত্রীর

কাছে অন্য কেহ সেকথার উত্থাপন করে নাই এবং সাবিত্রী সে সম্বন্ধে কোনও কথা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এক্ষণে পিতৃগৃহে আসিয়া সাবিত্রী সে কথা মানস-পট হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার বাসনা করিলেন। তিনি তাঁহার শিশু কন্যার জীবন নূতন করিয়া—নিজের মনের মতন করিয়া, গড়িয়া তুলিবেন স্থির করিলেন। পিতার গৃহে বৃদ্ধপিতা ব্যতীত তাঁহার এক বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন; উভয়ের অন্ধের যষ্ঠি স্বরূপ হইয়া সাবিত্রী কন্যাকে লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পাঁচবৎসর শান্তিতে কাটিয়া গেল, তৎপরে সাবিত্রীর পিতৃবিয়োগ হইল এবং কয়েকমাস পরেই বৃদ্ধা পিসিমাও ভ্রাতার অনুগমন করিলেন। সাবিত্রী এইবার তাঁহার মনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলেন।

তিনি ভাবিলেন হয় ত রামকানাইপুরের কোনও লোক ঘটনাক্রমে কখনও বিল্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা হইলে যে কথা তিনি দুঃস্বপ্নের মত বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেছেন—ঘটনাক্রমে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও পড়িতে পারে। তিনি স্থির করিলেন সেরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কা যাহাতে না থাকে—সেই পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। তিনি বিল্বগ্রাম হইতে কন্যাকে লইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইবেন। বিল্বগ্রামে হরিশঠাকুর নামে

একজন অতি নিরীহ প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—তাঁহার ত্রিসংসারে আপনার বলিতে কেহই ছিল না। একবার ঐ গ্রামে ওলাউঠার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয় এবং সেই মহামারীতে হরিশ ঠাকুরের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও জননীর সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয়। সেই সময়ে হরিশ ঠাকুরের কিছুদিন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রীর পিতা দয়াপরবশ হইয়া হরিশকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দেন। তদবধি প্রায় ২১ বৎসর হরিশ ঠাকুর সাবিত্রী-দের বাটীতেই বাস করিতেছিল। সাবিত্রীর পিতা যেমন তাহাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত স্নেহ করিতেন। হরিশও সেইরূপ সাবিত্রীকে আপনার কন্যার মত স্নেহ করিত ও জননীর মত শ্রদ্ধা করিত। হরিশ সাবিত্রীর নিতান্ত বাধ্য ছিল। সাবিত্রীর মাতা একজন ধনাঢ্যের কন্যা ছিলেন—তিনি পিতৃগৃহ হইতে বহু মূল্যবান অলঙ্কার লইয়া স্বামিগৃহে আইসেন এবং সাবিত্রীর মাতামহ মৃত্যুকালে কন্যা ও জামাতাকে প্রায় পাঁচ সহস্র টাকার সম্পত্তি দিয়া যান। সাবিত্রীর পিতা জমিদারী-রক্ষার ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। সাবিত্রী পিতৃ-সঞ্চিত সেই অর্থ ও অলঙ্কারাদি লইয়া, তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছেন এই কথা গ্রামের

লোকেদের বলিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সাবিত্রী যাহা করিতেন, হরিশ ঠাকুর সে বিষয়ে কখন কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদ করিত না—তাহার ধারণা ছিল সাবিত্রীর মত সুবুদ্ধিমতী নারী আর ত্রিজগতে কেহ নাই—সাবিত্রী কখনও কিছু অন্যায় করিতেই পারেন না। সাবিত্রী বলিলেন—"কাকা, আমরা এখান থেকে বাস তুলে অন্য যায়গায় না গেলে ইন্দুর লেখাপড়া শেখানর সুবিধে হবে না, তুমি কাকেও কিছু বলো না। বোলো আমরা কাশী বৃন্দাবন দেখতে যাবো।" হরিশ ঠাকুর সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া সাবিত্রীর আদেশ পালন করিল। সেই অবধি সাবিত্রী কলিকাতায় আসিয়া বাদুড়বাগানে যে ক্ষুদ্র বাটীখানিতে আছেন, সেই বাটী ভাড়া করিয়া সেইখানেই বাস করিতেছেন। তিনি ইন্দুর সেই শৈশবের বিবাহটাকে বিবাহ বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করেন নাই—তিনি ইন্দুর পুনরায় বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াই কলিকাতায় আইসেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—সেই ঘটনার কথা তিনি ভিন্ন কেহই জানে না—ইন্দু তাহা কখনও জানিতেও পারিবে না—সুতরাং তাহার পুনরায় বিবাহ দিলে যদি কোনও পাপ হয় সে পাপ তাঁহারই হইবে। প্রাণাধিকা কন্যার সুখের জন্য সে পাপের যদি পরলোকে

কোনও শাস্তি থাকে, তাহা তিনি অম্লান-বদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন ইন্দু বয়স্থা হইয়া উঠিল এবং অর্থের অভাবে, তিনি যেরূপ উচ্চ আশা করিয়াছিলেন—সেরূপ মনের মত পাত্রের সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ভাবিলেন—ইন্দুর না হয় নাই বিবাহ হইল—বিবাহ না হইলে কি আর মানুষ সুখী হয় না? আর বিবাহ দিলেই কি সকলে সুখী হয়, কত লোকে যে বালিকা বয়সেই বিধবা হয়? কুলীন কন্যার বিবাহ ত অনেক সময় পাপের শাস্তি মাত্র, সেরূপ বিবাহ না হওয়াই কি স্ত্রীলোকের পক্ষে সুখের নহে? সাবিত্রীর মনে যখন সেইরূপ নৈরাশ্য-জনিত দুঃখবাদের উদয় হইয়াছে, সেই সময়ে অজিত ডাক্তার হইয়া আসিয়া সম্মুখের বাটী ভাড়া করিল। তাহার পর সাবিত্রী যখন দেখিলেন অজিত তাঁহার প্রাণসমা ইন্দুকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তখন সাবিত্রীর মনে কঠোর নৈরাশ্যের পর আশার প্লাবন আসিল—তাঁহার হৃদয়াকাশে ঘনঘোর কাটিয়া গিয়া শারদাষ্টমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। যেদিন অজিতের জননী, ইন্দুর সহিত অজিতের বিবাহ প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া পাঠাইলেন, সে দিনে সাবিত্রীর কি আনন্দ! অজিতের মত রূপে গুণে সুপাত্র পাওয়া, অজিতের মত সম্ভ্রান্ত ঘরে ইন্দুর বিবাহ দেওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! বিবাহের পর অজিতের আরোগ্য-সংবাদ

লইয়া, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, যে দিন ইন্দু মাতৃসকাশে ফিরিয়া আসিল, সে দিন সাবিত্রীর সুখ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী মা কালীর পূজা দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কে জানিত মা কালী তাঁহার আশার গ্রাস মুখের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন? কে জানিত তাঁহার আশাতীত শান্তি সুখের অট্টালিকা বিধাতার এক নির্ম্মম ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রেণু রেণু হইয়া অকস্মাৎ ধূলায় মিশিয়া যাইবে? কে জানিত তিনি এ জগতের মধ্যে যাহার মুখ দর্শন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অনিচ্ছুক, সেই ঘনশ্যাম তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় করিয়া দিবার জন্য সেই কালীঘাটে কাঙ্গালী বেশে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে! এখন যে সে কঠিন নিয়তির মত তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবে না—পদে পদে তাঁহার মনের শান্তির ও ইন্দুর ভবিষ্যৎ সুখের হন্তারক হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। এখন তাহাকে অর্থ দেওয়া কেবল অনিবার্য্য বন্যার ক্ষণিক গতিরোধ করিবার আশায় বালির বাঁধ বাঁধা মাত্র, এ কথা বুঝিতে সাবিত্রীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'—ঘনশ্যামের আপাততঃ মুখবন্ধ করিবার জন্য তাহাকে অর্থ দিতেই হইবে। তাহারপর কি হইবে তাহা ভাগ্যবিধাতাই জানেন। ইন্দুর শৈশবের বিবাহবন্ধন অগ্রাহ্য

করিয়া তিনি ধর্ম্মের অমান্য করিয়াছেন বলিয়াই কি তাঁহার এই কঠোর শাস্তি? কিন্তু সে কি বিবাহ? সে যে অধর্ম্মের পৈশাচিক অভিনয়; সেই নিষ্ঠুর—অমানুষিক আচার লঙ্ঘন করিলে কি কোনও পাপ আছে? আর যদি পাপ থাকে সে জন্য তিনিই দায়ী, তাঁহার কন্যার ত কোনও অপরাধ নাই—তবে তাহার এ কঠিন শাস্তির বিভীষিকা কেন?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রীর চক্ষে নিদ্রা আসিল না। অতীত জীবনের চিত্রগুলি প্রত্যক্ষবৎ একে একে তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বকথা চিন্তা করিতে করিতে ভবিষ্যতের ভাবনা আসিল; সেই ভাবনায় তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুশ্চিন্তায় অকূল পাথারে পড়িয়া তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় শেষরাত্রে তাঁহার একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাবেশ আসিল। সেই সময়ে ইন্দু ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই শব্দে সাবিত্রীর তন্দ্রা ভঙ্গ হইল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাবিত্রী মনে করিয়াছিলেন ইন্দু ঘুমাইয়াছে। বিরাম-দায়িণী নিদ্রা যে তাঁহার মত দুশ্চিন্তার অসহ্য যাতনা হইতে ইন্দুকে অব্যাহতি দিয়াছে, একথা ভাবিয়া সাবিত্রী সেই দারুণ দুর্ভাবনার মধ্যেও মনে একটু সন্তোষ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অনুমান সাবিত্রীর ভ্রম। ইন্দু ঘুমায় নাই, সেও নিদ্রাহীনচক্ষে দুর্ভাবনার অন্তর্দাহ নীরবে ভোগ করিতেছিল। পাছে সাবিত্রী তাহার মনের কথা জানিতে পারেন—পাছে সাবিত্রীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে ইন্দু নিদ্রালস-ভাবে শয়ন করিয়াছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও নৈরাশ্যের তাড়নায় ইন্দুর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাহার হৃদয়ের ক্ষত হইতে প্রাণঘাতী রক্তমোক্ষণ হইতেছিল। ইন্দু নীরবে সেই যাতনা সহ্য করিতেছিল। সে যে ভয়ানক কথা শুনিল তাহা কি সত্য? সত্য না হইলে তাহার জননী, সেই দুর্বৃত্ত কাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কথায় ভীতা—সঙ্কুচিতা হইয়া যাইবেন, কেন? তাহাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন কেন—

তাহাকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? সে কথা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে ত তাহার অজিতের সহিত বিবাহ মিথ্যা হইয়া গেল! কিন্তু সে যে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া অজিতকেই জীবনমরণে একমাত্র পতি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে—তাহার কি হইবে? অজিত তাহাকে গ্রহণ না করিলেও সে ত জীবনে মরণে অজিতকে ত্যাগ করিতে পারিবে না? সে যে ইহকাল পরকালের জন্য প্রাণ মন অজিতকে সমর্পণ করিয়াছে—অজিত যে তাহার প্রাণের প্রাণে চিরদিনের জন্য জড়াইয়া গিয়াছে—তাহার প্রাণের তার ছিঁড়িয়া যাইলেও ত সে বন্ধন ছিঁড়িবে না! তাহার উপায় কি? হায়! তাহার মাতার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল—এ সাংঘাতিক কথা তাহাকে আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে ত সে সাবধান হইতে পারিত—কলুষিত মন্দিরে দেবতার পূত-মূর্ত্তি স্থাপন করিতে সাহসী হইত না। এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? সে এখন কোন সাহসে অজিতের পবিত্র গৃহ কলুষিত করিতে যাইবে? অজিত তাহার ইহজীবন পরজীবনের একমাত্র দেবতা—সে অজিতকে পূজা করিতে বাধ্য—কিন্তু অজিত ত তাহার পূজা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন? এ সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? হায়, কেন দেখা হইল! অজিতের সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বে ত তাহার জীবন একরকমে কাটিয়া যাইতেছিল।

তাহার সে উৎসববিহীন জীবনে এ ক্ষণিক সুখের মহাসমারোহ কেন আসিল! কিন্তু এ কি ক্ষণিক? অজিতের ভালবাসার স্মৃতি কি ক্ষণিক? তাহার তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে অজিতের সেই কয়দিনের ভালবাসা পাওয়া কি সৌভাগ্যের কথা নহে? কিন্তু তা'র পর? সে যে সেই অমূল্য ভালবাসা পাইবার যোগ্য। নহে—সে ভালবাসা পাইবার তাহার কোনও অধিকারই নাই—একথা জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া সে সেই ভালবাসার দাবী করিতে যাইবে? তাহা হইলে অজিতের শুভ্রশুচি দেবমূর্ত্তি যে কর্দ্দমাক্ত—অপবিত্র হইয়া যাইবে—সে কি প্রাণ থাকিতে তেমন কাজ করিতে পারে? সে কি এতই স্বার্থপর? সে কি তাহার চিরবাঞ্ছিতের এমন অনিষ্ট প্রাণ থাকিতে করিতে পারে? না—কিছুতেই নয়। কিন্তু তার পর? অজিতকে ছাড়িয়া সে কি লইয়া জীবন ধারণ করিবে!—ইন্দু আর ভাবিতে পারিল না; দারুণ উত্তেজনার পর তাহার দেহে যেমন একটা অবসাদ আসিয়াছিল, এক্ষণে দুর্ভাবনার পর দুর্ভাবনা, বারিধির অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গের মত কল্লোলিত হইয়া আসিয়া তাহার মনের উপরও একটা জড়তা আনিয়া দিল। সে অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত ভাবে সেই ভীষণ রাত্রির প্রথম দুই যাম অতিবাহিত করিল।

শেষরাত্রে সাবিত্রীর মত, ইন্দুরও তন্দ্রাবেশ আসিল।

সেই তন্দ্রাঘোরে ইন্দু স্বপ্ন দেখিল, যেন অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতেছে; আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—মুহুর্মুহু বিদ্যুতের জ্বলন্তরেখা দিঙ্‌মণ্ডলের সেই অন্ধ-তামসাবরণ চিরিয়া চিরিয়া দুর্য্যোগের ভীষণতা ভীষণতর করিয়া দেখাইতেছে। সুকিয়াষ্ট্রীট জলে ভরিয়া গিয়াছে—তাহাদের বাটীর সম্মুখের গলিতে নদী বহিয়া যাইতেছে—তাহাদের গৃহের মধ্যেও যেন আবক্ষ জল উঠিয়াছে। বাড়ীতে যেন আর জনমানব নাই—ইন্দু একাকিনী। বাহির হইতে—অজিতদের ছাদের উপর হইতে—যেন অজিত তাহাকে ডাকিতেছে—"শীগ্‌গির চলে এস—তোমাদের বাড়ী পড়ে যাবে দেরী কোরো না—রাস্তায় এস।" ইন্দু অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই জলপ্লাবন ভেদ করিয়া পথে বাহির হইয়া বিদ্যুতের আলোকে দেখিল, অজিত ছাদের উপর হইতে একখানি বস্ত্র, রজ্জুর মত পাকাইয়া ঝুলাইয়া দিয়া, বলিতেছে—"এই কাপড়খানা জোর করে ধর—আমি তোমায় টেনে তুল্‌ছি—এস এগিয়ে এস।" ইন্দু আকণ্ঠ জলরাশি অতিক্রম করিয়া পথের অপর পারে গিয়া প্রাণপণে সেই বিলম্বিত বস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিয়াছে এবং অজিত তাহাকে টানিয়া তুলিতেছে। সে প্রায় ছাদের নিকটে উঠিয়াছে—আলিসায় তাহার মস্তক ঠেকিয়াছে—অজিত তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে—অজিতের হস্ত তাহার মস্তকে স্পর্শ

করিয়াছে! এমন সময় সেই বস্ত্র ইন্দুর হাতের নিকট হইতে ছিন্ন হইয়া গেল এবং সে শূন্য হইতে বেগে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইল! ইন্দু আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল।

জাগ্রত হইয়া ইন্দু দেখিল, শয্যার উপর তাহার পার্শ্বে বসিয়া সাবিত্রী তাহাকে ডাকিতেছেন—"ইন্দু! ও ইন্দু! কেঁদে উঠলি কেন? কি হয়েছে!" ইন্দুর পাণ্ডুর ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল। মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ইন্দু যেন সেই দুঃস্বপ্নের উৎকট যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তখন গৃহমধ্যে বাতায়ন-পথে প্রভাতের নবারুণছটা আসিয়াছে দেখিয়া ইন্দু শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে গিয়া, পূর্ব্বদিনের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হেতু, দুর্ব্বলতায় একবার অকৃতকার্য্য হইল পরে দ্বিতীয় উদ্যমে উঠিয়া বসিল। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বপ্ন দেখেছিস্ বুঝি।" ইন্দু মৃদুস্বরে কহিল, "হুঁ"। ইন্দু আর কোনও কথা বলিল না। সাবিত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আছিস্ কেমন? এখন না হয় শুয়ে থাক্—উঠে কাজ নেই"। ইন্দু বলিল—"না, ভাল আছি।" ইন্দু মৌনাবলম্বন করিল দেখিয়া সাবিত্রীও তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি ইন্দুর প্রকৃতি বুঝিতেন। তিনি গৃহ কর্ম্ম করিতে উঠিয়া গেলেন।

গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া সাবিত্রী সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ইন্দু তাহার গাত্র হইতে শাশুড়ীর দত্ত সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং বিবাহের সময় শ্বশুর-বাড়ী হইতে যে সমস্ত মূল্যবান বস্ত্র ও সাজসজ্জার দ্রব্য-সামগ্রী ও অন্যান্য উপহার পাইয়াছিল সেইগুলি সমস্ত তাহার বৃহৎ তোরঙ্গের মধ্যে গুছাইয়া তুলিতেছে। সাবিত্রী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন,—"ও কি করছিস্।"

ইন্দু সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ত আবার সে আস্‌বে—তাকে কি দেবে?"

সাবিত্রী বিষণ্ণ বদনে উত্তর দিলেন, "আমার গয়না পত্র যা কিছু আছে—তাই দিয়ে আর বাকি টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেল্‌ব।"

ইন্দু স্থিরভাবে বলিল, "না—আর তাকে কিছু দিও না।"

সাবিত্রী। না দিলে—এখনি গিয়ে ওঁদের কাছে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে একটা গোল বাঁধাবে—শেষে হয়ত ওঁরা তোকে ঘরে নেবেন না।

ইন্দু পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে কহিল, ওঁরা নিলেও, আমি জেনে শুনে কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যাব্যো? তুমি কি সে পথ রেখেছ? আগে আমাকে ওকথা বলনি কেন মা? আমি ত আর ছোটটি নই? আমি যদি ঘুণাক্ষরে একথা জানতে পারতুম, তা'হলে

আমি কি তোমাকে এ পাপ করতে—তাঁর এমন সর্ব্বনাশ করতে দিতুম ?

সাবিত্রী আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই আর আমাকে ও কথা বলিস্‌নি ইন্দু! তোর ভালর জন্যই আমি এ কাজ করেছি—তা কি বুঝছিস্‌ না।"

ইন্দু। না মা, তুমি আমার ভাল খুঁজতে গিয়ে—এখন যাঁর ভালতেই আমার ভাল, তাঁর যত ক্ষতি করতে হয় তা করেছ। এখন আর লজ্জা সরমের সময় নেই মা—তাই মনের কথাটা খুলেই তোমায় বল্‌লুম।

সাবিত্রী অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিলেন—"তুই যদি একথা বলিস—তা হ'লে তোকে আর কি বোঝাব ? কিন্তু তুই সব কথা আগে শোন, তার পর যা বলতে হয় বলিস্‌।" এই কথা বলিয়া সাবিত্রী সংক্ষেপে পূর্ব্বকথা সমস্ত অকপটে ইন্দুকে শুনাইলেন। পরে বলিলেন-"এখন তুই-ই বল্‌—এতে আর দোষ হয়েছে কি ? সে কি আর বিয়ে। যা আমি চোখে দেখি নি—তুই যা জানিস না—তাও কি ঐ ঘনশ্যামের মত লোকের কথা শুনে বিয়ে বলে মান্‌তে হবে ?"

ইন্দু স্থির ভাবে বলিল—"বাবা যে ওর সঙ্গে ছিলেন বললে মা—তখন তুমি না মান—আমি না মানি—সমাজ যে মানবে মা। ওঁদের যে বংশগৌরব আছে—মান সম্ভ্রম আছে—

ধর্ম্মজ্ঞান আছে—মা আছেন—জ্ঞাতিরা আছেন—তুমি কি আমার জন্যে ওঁকে সে সব ত্যাগ করতে বল? এতটা ক্ষতি ওঁর করতে চাও? না মা আমার উপর ভালবাসার মোহে পড়ে যে মতিভ্রম হলেও আমি তোমাকে সে পাপ আর করতে দেবো না।, যা হয়ে গেছে—তা হয়ে গেছে।"

সাবিত্রী করুণনয়নে কিয়ৎক্ষণ ইন্দুর বিষাদাক্রান্ত মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে তুই করতে চাস্ কি?

ইন্দু বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আনত বদনে ধীরে ধীরে বলিল—"চল আমরা এখান থেকে দূরে অন্য কোথাও চলে যাই—যাতে তিনি আর আমাদের সন্ধান করতে না পারেন, কি জানি যদি মায়ায় পড়ে ওঁরও ভুল ভ্রান্তি হয় ওঁকে তেমন করে নিজের ক্ষতি আমি প্রাণ থাকতে করতে দেবো না।"

সাবিত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমরা এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেই কি সব গোল মিটে যাবে মনে করেছিস্?

ঘনশ্যাম যদি দুর্গাপুরে জ্ঞাতিদের কাছে গিয়ে তিলকে তাল করে সে কথা বলে দেয়—তা হলেও কি জামাইয়ের মাথা হেঁট হবে না?"

ইন্দু শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ও যে এতটা করতে পারে সে কথাটা আমি ভাবিনি মা। তা হলে ও যাতে তা না বলে, তা করতেই হবে। ওকে তা হলে টাকা দিতেই হবে; একেবারে বেশী দিও না—কিছু কিছু করে দিয়ে ওকে হাতে রেখো। যত দিন টাকা হাতে থাকবে, ওকে দিতেই হবে: এতে যদি শেষে আমাদের ভিক্ষে করতে হয় সেও ভাল—যেমন পাপ তেমনি তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সাবিত্রী বলিলেন, "তা যেন হলো—কিন্তু তাতেও ত সব গোল মিটবে না? আমরা এখান থেকে চলে গেলে, যদি মন্দ লোকে কোন দুর্নাম রটায়—তাতেও তো জামাইএর মাথা আরো হেঁট হবে?"

সে কথা শুনিয়া ইন্দুর ম্লান মুখ প্রথমে ঘৃণায় আরক্তিম পরে ভীতিতে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, ভয়স্বরে কহিল, "না—তাও যাতে না হয়, এমন কোন উপায় করে যেতে হবে। কি করতে হবে তা তুমি ভেবে ঠিক কোরো মা। তাঁর মনে সে রকম সন্দেহ উঠবে না তা আমি জানি, কিন্তু আর পাঁচ জনে যাতে কিছু বলতে না পারে, তার উপায় করতেই হবে।"

সাবিত্রী শেষে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না—তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "এ সব যেন হলো—কিন্তু কি

করতে বসেছিস্ তা ভেবে দেখেছিস্? তোর দশা কি হবে তা ভাবছি।—কি ছেড়ে যাচ্ছিস্ তা ভাবছিস্।"

ইন্দু গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না মা—সে ভাবনা ভাববার মনের বল আমার নেই—আমাকে কাঁদিও না।—" এইকথা বলিয়া ইন্দু উঠিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, তাহার নয়ন-দ্বয় হইতে দর দরিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

সাবিত্রী তখন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু সকল আশা ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা হইতে চিরবিদায় লইতে সাবিত্রীর কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। তিনি পুনরায় ইন্দুকে অনেক বুঝাইলেন,—মিনতি, কাতরোক্তি, ক্রন্দন কিছুই বাকি রাখিলেন না; কিন্তু ইন্দুর কিছুতেই মতের পরিবর্ত্তন হইল না। সাবিত্রী শেষে বুঝিলেন যে জীবনের উপর ইন্দুর যেরূপ একটা উদাসীন ভাব বা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, তাহাতে তাহার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, হয় ত সে আত্ম ঘাতিনী হইবে, তখন কন্যাগত-প্রাণা সাবিত্রী কন্যার ইচ্ছা পালন করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই দিন অপরাহ্নকালে ঘনশ্যাম আসিয়া যখন বলিল, "ঠাকরুণ বাকি টাকাটা ফেলে দাও, তাহলে কালই দেশে যাই। তোমার আর ভাবনা কি? রাজা জামাই হয়েছে মেয়ে জামাই নাতি পুতি নিয়ে তোফা মজায় থাকবে।"

সাবিত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, "বাকি টাকার অর্দ্ধেক আজ নিয়ে যাও, আর অর্দ্ধেক একেবারে দেবো না—মাসে মাসে দেবো।"

ঘনশ্যাম। ঐ ত গোল কর বৌ ঠাকরুণ! বলেছিত পাঁচ শ' টাকার—একটি পয়সা ছাড়লে, আমার চল্‌বে না—মাসে মাসে আবার কেন?

সাবিত্রী। নইলে তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি যদি আজ টাকা নিয়ে গিয়ে, কাল ওদের কাছে যা-তা বলে এস?"

ঘনশ্যাম। রাধামাধব! আমাকে কি তেমনি নেমকহারাম পেয়েছ? টাকাটা পেলেই মুখে একেবারে চাবি কুলুপ পড়ে যাবে—তার পর আর কোনো বেটার সাধ্যি নেই যে আমার পেট থেকে একটি কথা বের করে।

সাবিত্রী। তা হলেও আমাকে সাবধান হতে হবে। আমি মাসে মাসেই তোমাকে টাকা দেবো—পাঁচশ কেন বেশীই দেবো; কিন্তু যদি সে কথা কোন রকমে প্রকাশ হয় তা হলে সেই দিন থেকেই টাকা বন্ধ করব।

ঘনশ্যাম। তা বেশ—কিন্তু উপস্থিত বাকি তিনশ টাকাটা আজ দাও, তার পর মাসে মাসে যা দেবার তা দিও। তোমার এখন লক্ষীর ভাণ্ডার হতে চল্‌লো!

অগত্যা সাবিত্রী গহনায় ও নগদে, তিন শত টাকাই

ঘনশ্যামকে দিলেন এবং বলিলেন, সে যতদিন কথাটা প্রকাশ না করিবে ততদিন তাহাকে মাসে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিবেন : ঘনশ্যাম কিছু বিস্মিত কিন্তু হৃষ্ট হইয়াই বলিল, "তা হলে এখানে এসেই টাকাটা নিয়ে যাবো ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "না, এখানে আর এসো না—এখানে আমরা থাকবো না, যেখানে যাবো তার ঠিকানা তোমাকে পরে জানাবো। কিন্তু সে ঠিকানা যদি কারো কাছে প্রকাশ করো তাহলে সেই দিন থেকেই তোমার টাকা বন্ধ করব। যদি বল আমরা যদি ঠিকানা তোমাকে না দিই ; তা হলেও তোমার কিছু ক্ষতি হচ্ছে না—তুমি যা চেয়েছিলে তা ত পেলে ?"

ঘনশ্যাম পূর্ব্ববৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ তা পেলাম বৈ কি—আর তোমার ঠিকানারই বা ভাবনা কি ? জামাই বাবাজির বাসা ত এই সুমুখেই—আর দেশের ঠিকানাও ত জানা আছে।"

সাবিত্রী ত্রস্তভাবে বলিলেন, "না সেখানে কখনো আমাদের কোন কথা জানতে যেতে পারবে না। তাদের বাড়ীর দরজা যেদিন মাড়াবে সেই দিন থেকে আর এক পয়সা দেবো না—তা ঠিক জেনো। ইন্দু সেখানে যাবে না—আমার কাছেই থাকবে।"

সে কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম অধিকতর বিস্মিত হইল

কিন্তু সে বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল, "তোমার ঠিকানা যদি জানাও তাহলে আ:) সেখানে যাবার আমার দরকার কি? কিন্তু সাবধান আমার সঙ্গে চালাকী করলেই প্যাঁচে পড়বে, তা বলে দিচ্ছি।" এইরূপ শাসাইয়া ঘনশ্যাম সন্দিহান মনে বিদায় লইল। সে স্থির করিয়াছিল, সাবিত্রীর কাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া এখন কিছুদিন সে মধ্যে মধ্যে গিয়া যাহা পারে টাকা আদায় করিতে থাকিবে; তাহার পরে ইন্দু শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া দুই এক বৎসর ঘর করিয়া যখন সন্তানবতী হইবে এবং যখন ইন্দুকে ত্যাগ করিলেও তাহাকে গৃহে লইবার জন্য কুল-কলঙ্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ও স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হইবে, সেই সময়ে ইন্দুর পূর্ব্ব-বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতেও সে প্রচুর অর্থ শোষণ করিতে পারিবে। ইন্দু স্বামিগৃহে যাইবে না শুনিয়া ঘনশ্যামকে শেষোক্ত সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু ইন্দুকে যদি স্বামিগৃহে পাঠাইবে না, তবে সাবিত্রী তাহাকে টাকা দিতেছেন কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইল না। যদি কন্যাকেই শ্বশুর গৃহে পাঠাইবে না তবে, তাহার শ্বশুরদের অপবাদই হউক বা সমাজে তাহাদের একঘরেই করুক, তাহাতে সাবিত্রীর

কি আসিয়া যায়? ইন্দু যে নিজের নারী-জন্মের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়াও, স্বামীর সুনাম রক্ষার জন্য, তাহার মাতাকে অর্থব্যয় করিতে বাধ্য করিবে, সেই সূক্ষ্মধারণা ঘনশ্যামের মনে তিলার্দ্ধ স্থান পাইল না। সে ভাবিল সাবিত্রী ভুল বুঝিয়া তাহাকে টাকা দিয়াছেন, এবং কিছুদিন পরে তিনি যখন তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন তখন আর তাহাকে টাকা দিবেন না। কিন্তু এখনও সাবিত্রীর মনে যে, ইন্দুর স্বামিগৃহে যাহাতে তাহার পূর্ব্ব-বিবাহের কথাটা প্রকাশ না হয়, সে আগ্রহ বড়ই প্রবল, সে কথা ঘনশ্যাম বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে স্থির করিল সাবিত্রীর মনের সেই আগ্রহ প্রবল থাকিতে থাকিতে তাঁহার নিকটে যে অর্থ আছে তাহা যে প্রকারেই হউক নিঃশেষে শোষণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই শেষে অন্নদায়ে বাধ্য হইয়া সাবিত্রী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবেন; এবং ইন্দু কিছুদিন স্বামিগৃহে বাস করিলেই ঘনশ্যাম তাহার শ্বশুর ও স্বামীর নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং প্রথমে সাবিত্রীকে সর্ব্বস্বান্ত করাই নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ঘনশ্যাম স্থির করিল এবং তাহারই উপায় চিন্তা করিতে তৎপর হইল।

ঘনশ্যাম বিদায় লইলে সাবিত্রী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজিত

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সে বাটী ত্যাগ করিতে হইবে; সেইজন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাবিত্রীকে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইল, এবং হরিশ ঠাকুরকে সকল কথা বলিতে হইল। হরিশ ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। ইন্দুর শৈশবের বিবাহের কথাটা হরিশ নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিল এবং সেইজন্য অজিতকে ত্যাগ করিয়া—তাহাকে কোনও সংবাদ অবধি না দিয়া—অন্যত্র যাওয়া ব্যাপারটা হরিশ নিতান্ত অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিল। প্রকৃতপক্ষে অজিতের সহিত চির-বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় হরিশঠাকুর অন্তরে দারুণ আঘাত পাইল। সাবিত্রীর ইচ্ছায় বাধা দিবার হরিশের ক্ষমতাও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না, সুতরাং সাবিত্রীর সকল আদেশ হরিশ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পালন করিতে লাগিল। কিন্তু হরিশের মনে হইল এইবার সাবিত্রীর বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—তিনি অন্যায় করিতেছেন। হয়ত কিছুদিন পরে ভগবান সাবিত্রীকে সুমতি দিবেন, তাহা হইলে সাবিত্রীর ও ইন্দুর মনের ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে এবং অজিতের সহিত আবার তাঁহাদের মিলন হইবে। আপাততঃ উহারা যাহা বুঝিতেছে তাহাই করুক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইন্দু যে দিন দুর্গাপুর হইতে কলিকাতায় আইসে তাহার পর দিন হইতে অজিতের মনে সত্বর সুস্থ ও সবল হইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসিল। তিন চারি দিনের মধ্যে অজিত তাহাদের বাটীর নিকটস্থ বাঁকা নদীর ধারে সুন্দর পথটীতে বেড়াইতে আরম্ভ করিল এবং সপ্তাহেক পরেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে এই কথা প্রকাশ করিল। শরৎসুন্দরী তাহাকে আরও কিছু দিন দুর্গাপুরে থাকিবার কথা বলাতে, অজিত তাঁহাকে বুঝাইল তাহার নূতন প্রাকৃটিসের ক্ষতি হইতেছে এবং কলিকাতার বায়ু পরিবর্ত্তনে তাহার উপকারই হইবে। পুত্রের কলিকাতায় যাইবার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া শরৎসুন্দরী আর কোনও আপত্তি করিলেন না। অজিত দুই দিন পরেই কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির করিয়া বিপ্রদাসকে ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাইতে লিখিয়া পাঠাইল। ইন্দু কলিকাতায় যাইবার পর দিন সুরমা, কন্যাকে লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়াছিল এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। শরৎসুন্দরী

বলিয়াছিলেন মাসেককাল পরেই তিনি শুভ দিন দেখিয়া, অজিতের সঙ্গে ইন্দুকে দুর্গাপুরে যাত্রা বদল করিয়া যাইতে, আনাইবেন। তৎপরে যখন ইন্দু পুনরায় কলিকাতায় যাইবে, সুরমাকেও পিত্রালয় হইতে আনাইয়া তিনি ইন্দুর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। অজিতকে সে কথা শরৎসুন্দরী বলিয়া দিলেন।

কলিকাতায় আসিবার দিন অজিতের মনের স্ফূর্ত্তি জগৎ-সংসারকে তাহার চক্ষে যেন এক নূতন সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত করিল। রেলপথের পার্শ্বের চিরপরিচিত শস্য-ক্ষেত্র, প্রান্তর, উদ্যান, গ্রাম, নদী, তড়াগ, পুষ্করিণীগুলি যে এত সুন্দর, তাহা সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই কেন, তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্যবোধ করিল। ক্রমে যখন ট্রেন কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল, তখন বাসায় যাইবার জন্য তাহার মন এতই ব্যগ্র যে রাজধানীর জনাকীর্ণ পথের বৈচিত্র্যময় দৃশ্য তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া ছায়াবাজির মত ভাসিয়া গেল। কিছুতেই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। তাহার মন পড়িয়াছিল তাহার বাসাবাটীর সম্মুখের সেই ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীটীর উপর—কখন সে ইন্দুর সান্নিধ্য অনুভব করিবে সেই চিন্তায়। বাসার দ্বারে আসিয়া গাড়ি থামিলে কিন্তু অজিত ইন্দুদের বাড়ীর দিকে চাহিতে পারিল না, পাছে তাহার ঈপ্সিত-

দর্শন-জনিত অত্যধিক আনন্দ সে সহ্য করিতে না পারে। তাহার মনকে সেই আনন্দ উপভোগের জন্য প্রস্তুত করিতে সে ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে উঠিয়া গেল এবং তাহার পথের বেশ পরিবর্ত্তন করিল। পরে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দৃষ্টি স্বতঃই ইন্দুদের বাটীর দিকে ধাবিত হইল এবং চঞ্চল-প্রেক্ষণে, জানালার কবাটের মধ্য হইতে বা ছাদের প্রাচীরের পার্শ্ব, হইতে, দুইটি উৎসুক-চক্ষুর অনু-সন্ধান করিল। হঠাৎ সদর দ্বারের দিকে চাহিতেই, দ্বারে কুলুপ-দেওয়া দেখিয়া অজিত চমকিয়া উঠিল। অজিত ডাকিল "গুরুচরণ!" ভৃত্য গুরুচরণ নিকটে আসিতেই অজিত প্রশ্ন করিল, "ওঁদের বাড়ীতে চাবি দেওয়া কেন রে?"

গুরুচরণ। ওঁরা দেশে গেছেন?

অজিত। দেশে গেছেন! কবে গেছেন?

গুরুচরণ। আজ ভোরে।

অজিত। হঠাৎ সেখানে গেলেন যে?

গুরুচরণ। বিয়ে টিয়ে—হলে ওঁদের দেশে সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুর আছেন, তাঁকে পূজো দিতে হয়, তাই গেছেন।

অজিত। কবে আস্‌বেন কিছু বলে গেছেন?

গুরুচরণ। তা কিছু শুনিনি; বোধ হয় মামাবাবুকে বলে গেছেন।

অজিত। ওঁরা শুনে ছিলেন কি—আজ আমি আস্‌বো?

"শুনেছিলেন বইকি।" এই কথা বলিয়া গুরুচরণ চলিয়া যাইতেই অজিত নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বহু আশার পর এই অভাবনীয় নৈরাশ্যে অজিত অভিভূত হইয়া গেল। তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। আজ সে আসিবে জানিয়াও আজই কি বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন? এক দিন অপেক্ষা করিলে কি চলিত না? তাহাকে সংবাদ দেওয়াও কি উচিত ছিল না? অজিত চিন্তাকুল-নয়নে সান্ধ্য-গগনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রক্ত-সন্ধ্যার মেঘমালা যেন তাহার অন্তরের দাবদাহ প্রতিফলিত করিল। সে নৈরাশ্য-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে মাতুলের আপিস হইতে আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বিপ্রদাস কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া অজিতকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, অজিত নিজ হৃদয়ের ব্যগ্রতা যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা কবে আস্‌বেন বলে গেছেন কি?"

বিপ্রদাস বলিল, "না, তাত কিছু বলে যান নি। ওঁদের যাওয়াটা বোধ হয় হঠাৎ হ'ল। কাল রাত্তিরে হরিশ-ঠাকুর আমাকে ডেকে আমাদের এখানে বৌমার তোরঙ্গটা রেখে গেলেন; বল্লেন, ওতে গহনা পত্তর সব আছে। দেশে চোর ডাকাতের ভয়, তাই গয়না এখানে রেখে গেলেন।

বাড়ীর চাবি, তোরঙ্গের চাবি টাবি গুলোও রেখে গেছেন, আর তোমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন। তোরঙ্গটায় দামী গয়না টয়না আছে বলে আমার ঘরে সেটাকে রাখিয়ে চাবি দিয়ে গিয়েছিলুম। সব তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অজিত। কবে আসবেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি?

বিপ্রদাস। না, মনে করেছিলুম সকালে উঠে জিজ্ঞাসা কর্‌বো; তা ভোরেই উঁরা গুরুচরণকে ডেকে বাড়ীর চাবিটা রেখে চলে গেছেন। ওঁদের দেশে যাওয়া ত সহজ নয়—রেল থেকে নেমে নৌকায় একবেলা যেতে হয়। শুনেছি এর পরে বর্ষা এলে, ঝড় তুফান আছে—যেতে পার্‌বেন না। আর পূজোটাও বোধ হয় মানা ছিল, না গেলে নয়। তাই তাড়াতাড়ি গেলেন, শীগ্‌গিরই ফিরবেন বোধ হয়।" এই কথা বলিয়া বিপ্রদাস প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যদের দ্বারা ইন্দুর তোরঙ্গটি বহন করাইয়া আনিয়া অজিতের কক্ষে রাখিয়া তাহার হস্তে চাবিগুলি ও চিঠি-খানা দিয়া গেল। অজিত ভৃত্যদের সমক্ষে সে চিঠি পড়িল না, পকেটে রাখিয়া দিল। আহারাদি সমাপনান্তে ভৃত্যেরা শয়ন করিতে যাইলে, অজিত তাহার কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া, কম্পিত হৃদয়ে চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র চাবি এবং দুইটী মাত্র ছত্র লেখা একখণ্ড কাগজ। লেখা

আছে "চাবিটি গহনার বাক্সর—তোরঙ্গর মধ্যে বাক্স আছে—সেই বাক্সে চিঠি আছে—গোপনে পাঠ করিও।"

অজিত আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে ইন্দুর বিবাহের সময় যে সমস্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি শরৎসুন্দরী দিয়াছিলেন সেইগুলি স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। তাহার নিচে গহনার বাক্স ও অপরাপর বিলাস-দ্রব্য বাক্সটীর মধ্যে, বিবাহের সময় শরৎসুন্দরী ইন্দুকে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, সেগুলি সমস্তই রহিয়াছে, অথচ ইন্দুর মাতা তাহাকে যে সমস্ত গহনা দিয়াছিলেন সেগুলি নাই। অজিত বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ কেমন হইল? উঁহাদের নিজের গহনা চুরি যাইবার ভয় যদি না থাকে তাহা হইলে আমাদের দেওয়া গহনাগুলি পরিয়া যাইতে দোষ কি ছিল? এগুলি যদি চোরে ডাকাতে লইতে পারে, তাহা হইলে সে গুলিও কি লইতে পারে না? গহনার বাক্সর ট্রে খানি তুলিতেই অজিত যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইল। চিঠিখানির খামের উপর লেখা আছে 'গোপনীয়'। অজিত ব্যগ্রভাবে চিঠির খাম ছিঁড়িয়া দেখিল, চিঠিখানি সাবিত্রীর লেখা। তাহাতে লেখা আছে—

"চিরঞ্জীবেষু—

বাবা অজিত, আমরা বড় কাঁদে পড়েই আজ তোমাকে

ছেড়ে চলেছি। আমাদের খোঁজ কোরো না—খুঁজলেও সন্ধান পাবে না। কেন যাচ্ছি, সে কথা জেনে তোমার মনের কষ্ট কমবে না—হয়ত অশান্তিই বাড়বে। তবে এ কথা বলতে পারি—আমি কন্যাস্নেহে পড়ে একটা কথা গোপন রেখে ইন্দুর বিয়ে দিয়েছি। সে জন্যে তোমার কাছে একটা অপরাধ করেছি। কিন্তু সে কথাটাকে সামান্য ভেবেই সেটাকে আমি অপরাধ বলেই ধরিনি, তুমিও হয়ত সেটাকে অপরাধ বলে ধর্ত্তে না—আমাকে ক্ষমা করতে। কিন্তু বিয়ের পরে সে দিন হঠাৎ ইন্দু সে কথাটা জানতে পেরে আমার অপরাধটাকে এতই বেশী করে তুললে—তাতে তোমার এত ক্ষতি হবে মনে করলে—যে সে আমার অপরাধটাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না। তাই সে আজ তার প্রাণের চেয়ে বড় তোমাকে জন্মের মত ছেড়ে গিয়ে আমার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছে। বুঝতেই পারছ, তোমাকে ছেড়ে যেতে তার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছে —এখন তাকে হারাবার আগে আমার মরণ হলে বাঁচি।

তোমার মা ঠাকুরুণ ও আর সব আপনার লোকেরা যখন আমাদের খোঁজ করবেন, তখন দেশে যাবার সময় নৌকাডুবি হয়ে গেছি—এই রকম কিছু একটা বলে আমাদের সুনাম আর নিজের মান রেখো। পাছে লোকে সন্দেহ করে

যে আমরা ইচ্ছা করে নিরুদ্দেশ হচ্ছি. তাই বাড়ীর জিনিষ পত্র সব রেখে—এক মাসের ভাড়া আগে দিয়ে যাচ্ছি। এর পর তুমি জিনিষগুলো যাকে ইচ্ছা বিলিয়ে দিও,—নয়ত বিক্রয় করে সেই টাকা গরিব দুঃখীদের দান কোরো। তোমার মনে যে কি কষ্ট দিচ্ছি—তা বুঝতে পারছি। যদি আমার তুচ্ছ প্রাণটা দিয়েও তোমার সে কষ্ট নিবারণ করতে পারতুম তা হলে নিশ্চয়ই দিতুম। কিন্তু সে উপায় নেই যে বাবা! আশীর্ব্বাদ করি তুমি রাজ-রাজেশ্বর হও—আমাদের কথা ভুলে যাও।

তোমার শুভাকাঙ্খিনী
শাশুড়ী।"

সেই পত্র পাঠ করিয়া অজিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না—ব্যাপার কি। সাবিত্রীদের জাত্যংশে কি কোনও দোষ ছিল? সাবিত্রীর নিজের কি কোনও দুর্ণাম ছিল? না. তাহা হইতেই পারে না। হরিণঠাকুর সারল্যের অবতার—সে কখনই সে কথা গোপন করিতে পারিত না। অজিত ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না, সাবিত্রী তাহার নিকট এমন কি কথা গোপন রাখিয়াছিলেন, যাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা তাহাকে ত্যাগ করাই ইন্দু শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিল। সে কথা তাহার কাছে প্রকাশ করিতে এত কুণ্ঠা কেন? এখন তাঁহাদের মান অপমান

কি অজিতের মান অপমান নহে—ইন্দুর সুখ দুঃখের জন্য অজিত কি এখন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী নহে? তবে ইন্দু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিল না কেন? ইন্দু নিশ্চয়ই তাহাকে ততটা আপনার ভাবে না? অজিতের পুনরায় অভিমান হইল। সে সঙ্কল্প করিল আর ইন্দুদের কথা ভাবিবে না! ভোরঙ্গ বন্ধ করিয়া সে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু নিদ্রা তাহার মৌখিক আহ্বান গ্রহণ করিল না; চিন্তা তাহাকে সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া রাখিল—ক্লিষ্ট করিল।

প্রাতঃকালে অন্যদিনের মত শয্যা তুলিতে আসিয়া গুরুচরণ দেখিল অজিত ইন্দুদের বাটীর ছাদের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গুরুচরণকে দেখিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে—ওঁরা ত সবে কাল গেছেন, তবে ছাতের গাছ গুলো—অমন হ'য়ে শুকিয়ে গেছে কেন—যেন চার পাঁচ দিন জল পায় নি?

গুরুচরণ বলিল, "চার পাঁচ দিন কি? বোধ হয় আজ সাত দিন জল পায় নি।—ওঁরা গেল শনিবারে কালীঘাটে গিয়েছিলেন—তার পর দিনই বৌদিদির ভারি অসুখ হয় কিনা? কালীঘাটের একটা কাঙ্গালী-বামুন এসে কি সব গোলমাল বাধিয়ে ছিল। গণ্ডগোল শুনে আমি গিয়ে দে

ওবাড়ীর গিন্নী ঠাকরুণ "মেয়েটাকে মেরে ফেল্লে গো" বলে কাঁদছেন আর সেই লোকটাকে বক্‌ছেন। আমি ডাক্তার ডেকে দিলুম—বৌদিদি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; তাঁর জ্ঞান হলে লোকটাকে কি টাকা গয়না টয়না দিয়ে গিন্নিমা বিদেয় করে দিলেন। সে দিন থেকে ওঁরা সবাই যেন কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিলেন, কারুর সঙ্গে কথাই কইতেন না—বাড়ীর দরজা দিয়েই রাখতেন; আর বৌদিদিরও বোধ হয় অসুখ সেই অবধি সারে নি—তিনি ও ঘর থেকেই বেরুতেন না—কে আর গাছে জল দেবে! অমন অসুখ নিয়ে দেশে এখন না গেলেই হ'ত।"

এই কথা বলিয়া গুরুচরণ অজিতের শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। অজিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা-মগ্ন থাকিয়া সহসা তাহার নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া—সে অভ্যাস মত দৈনন্দিন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই চিন্তা-রাশি হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। অজিত রোগী দেখিতে যাইল—চিন্তা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সে ইন্দুদের বাটীর চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে—তক্তপোষ, বাক্স, সিন্দুক, তৈজস-পত্র সমস্তই যথা স্থানে রহিয়াছে। কেনেরী পাখীর শূন্য খাঁচাটী ঝুলিতেছে—পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত—পাখীটাকে ছাড়িয়া দেওয়া

হইয়াছে। ইন্দুর বই, খেলানা, ছবি যেখানে যাহা ছিল, ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে। ইন্দুর শতস্মৃতি-বিজড়িত সেই শূন্য-বাটী যেন অজিতকে গ্রাস করিতে আসিল। সে ত্বরিত-পদে সেই বাটী হইতে বহির্গত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

তাহার পর সপ্তাহেক কাল অজিত কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। ইন্দু যে তাহাকে কোন কথা জানায় নাই—ইন্দুও যে তাহাকে এত পর ভাবিতে পারিয়াছে—সেই চিন্তা তাহার অভিমানকে জাগাইয়া রাখিল। সেই অভিমানের উপর নির্ভর করিয়া অজিত তাহার মনকে নিত্যই প্রবোধ দিত—সে আর ইন্দুর কথা ভাবিবে না। কিন্তু তাহার মন কোন দিনই সে আত্মপ্রতারণায় ভুলিত না। শেষে অজিত বুঝিতে পারিল ইন্দুর চিন্তা তাহার হৃদয়-শোণিতে—অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া আছে; সে চিন্তা ত্যাগ করিলে তাহার জীবনে কোন আস্থা থাকিবে না, সে তাহার দেশের বা দশের কোন কাজেই আসিবে না—তাহার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে। তখন সে স্থির করিল যেরূপেই হউক ইন্দুর সন্ধান তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু ইন্দুরা যে ইচ্ছা করিয়াই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে কথা ত কাহাকেও বলা যায় না?—সুতরাং অপরের সাহায্য না লইয়া অজিত নিজেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অজিত বিল্বগ্রামে ও

রামকানাইপুরে লোক পাঠাইল; সেখানে ইন্দুদের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। কালীঘাটে ও অপরাপর স্থানে অন্বেষণও বিফল হইল। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। ইন্দুদের বাটির ভাড়া দিয়া অজিত সে বাটী নিজের অধিকারেই রাখিল। হয়ত ঘটনাচক্রে ইন্দুরা স্বেচ্ছায় ফিরিয়া আসিতে পারে—এ আশা অজিত হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে আশা অজিতের মনে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। শেষে দেশে যাইবার সময় নৌকাডুবির আশঙ্কার কথায় অজিতকে প্রশ্রয় দিতে হইল। সাবিত্রী নিজেই তাঁহার ঠিকা ঝি দামিনীর কাছে, তাঁহাদের দেশে যাইবার সময় ঝড় তুফানের ভয় আছে, একথা বলিয়া গিয়াছিলেন। সাবিত্রীদের ফিরিতে বিলম্ব হইলে যখন সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়ে দামিনী আসিয়া সেই ঝড় তুফানের ভয়ের কথা অজিতদের পরিচারক-মহলে প্রচার করিয়া গিয়াছিল। বিপ্রদাস সেই সন্দেহের কথা শরৎসুন্দরীকে জানাইয়া ছিল। শরৎসুন্দরী সেই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া অজিতকে লিখিয়া পাঠাইলেন, সে কথায় তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না—তাঁহার বধূমাতার নিশ্চয়ই অপর কোনও বিপদ ঘটিয়াছে; তাঁহাদের যেন ভাল

করিয়া অনুসন্ধান করা হয়—যত অর্থ ব্যয় হউক, অনুসন্ধান করিতেই হইবে। অজিত যখন দেখিল যে তাহার নিজের নিষ্ফল অন্বেষণে বৃথা কালক্ষেপ হইতেছে মাত্র, তখন সে বাধ্য হইয়া তাহার বন্ধু সুবোধের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং তাহাকে ইন্দুদের অনুসন্ধান করিয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। সুবোধ ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করিত এবং একজন দক্ষ গোয়েন্দা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। অজিত তাহাকে দীর্ঘ অবকাশ লইতে বলিল এবং সে জন্য তাহার বেতনাদির যাহা ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিল। সুবোধ সে প্রস্তাবে কুণ্ঠিত হওয়াতে, অজিত বলিল—"ভাই। যদি তাকে না পাই, তাহলে আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। তখন টাকা নিয়ে আমার কি হবে? তুমি ত জান, টাকার আমার অভাব নেই—তখন শুধু শুধু তোমার ক্ষতি আমি করতে যাব কেন? তুমি যদি তাকে খুঁজে দিতে পার, তাহলে আমার কি উপকারটা তুমি করবে তা বুঝতে পারছ ত? টাকার কথা ভেবো না—এ কাজের সুবিধার জন্যে, যত টাকার দরকার হয় তা আমি দেবো—যাতে তাকে শীগ্‌গির পাওয়া যায় তুমি তার উপায় কর।"

সুবোধ অবশেষে অজিতের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইল এবং অজিতকে আশ্বাস দিল যেরূপে হউক তাহার নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীর সন্ধান করিয়া দিবে।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সুবোধ প্রথমে, সাবিত্রীর যে পত্রখানি রমেশের নিকট ছিল তাহা নিজে পাঠ করিল, এবং গুরুচরণকে ও দামিনীকে প্রশ্ন করিয়া তাহারা যাহা কিছু জানিত তাহা তাহাদের মুখে স্বকর্ণে শুনিল। পরে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একাধিকবার কালীঘাটে গিয়া তাহাদের বর্ণিত কাঙ্গালী-ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিল। ডালাওয়ালার দোকানে এবং কালীঘাটের বহুলোকের নিকট তত্ত্ব লইয়া সুবোধ অবগত হয় যে, সেই কাঙ্গালী-ব্রাহ্মণের নাম ঘনশ্যাম এবং সাবিত্রীরা যে সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে ঠিক সেই সময় হইতেই তাহাকেও কেহ কালীঘাটে দেখিতে পায় নাই। কালীঘাটে অপর কোনও সংবাদ না পাইয়া সুবোধ সাবিত্রীর পিত্রালয় বিল্বগ্রামে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। সেখানে গিয়া শুনিল যে দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে সাবিত্রী তাঁহার বালিকা কন্যাকে লইয়া তীর্থ দর্শন করিতে গিয়া আর দেশে ফিরেন নাই—দেশের লোক তাঁহার আর কোনও সংবাদই জানে না। সাবিত্রীর সেখানে সুখ্যাতিই সকলে করিল—তাঁহা-

দের জ্ঞাতাংশে কোনও দোষের বা অপর কোনও দুর্ণামের কথা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সুবোধ আবিষ্কার করিতে পারিল না। ঘনশ্যামকে বিল্বগ্রামের কেহই জানে না।

বিল্বগ্রামে অনুসন্ধান করিয়া, সাবিত্রীদের নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি অথবা তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন তাহার কোনও সংবাদ অবগত হইতে না পারিয়া সুবোধ রামকানাইপুরে যাত্রা করিল। সেখানেও সাবিত্রীরা কোথায় আছেন সে কথা কেহই বলিতে পারিল না। এবং সাবিত্রীর স্বামী ত্রিপুরাচরণের অথবা সাবিত্রীর নিজের কিংবা তাঁহাদের বংশের যে এমন কোনও দোষ ছিল যাহা প্রকাশ হইবার ভয়ে সাবিত্রীকে তাঁহার বিবাহিতা কন্যাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইতে হয়, সেরূপ কোন সংবাদই সুবোধ প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু সেখানে ঘনশ্যামের সংবাদ সহজেই মিলিল। রামকানাইপুরের বহু লোকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া সুবোধ অবগত হইল যে ঘনশ্যাম ত্রিপুরাচরণের নিত্য সহচর ছিল। ত্রিপুরাচরণের মৃত্যুর পর ঘনশ্যাম দৈন্য-দশায় পড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। কলিকাতা হইতে সে মধ্যে মধ্যে যৎসামান্য টাকা পাঠাইত, তাহাতেই অতি কষ্টে তাহার

সংসার চলিত এবং বৎসরে দুই একবার মাত্র সে দেশে আসিত। কিন্তু এক্ষণে হঠাৎ তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিন চারি মাস হইল সে দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। সে প্রচার করিয়াছে ধন্নুলাল আগরওয়ালা নামে কলিকাতায় হাটখোলার একজন মাড়োয়ারী মহাজনের একমাত্র পুত্র জ্বর-বিকারে মৃতপ্রায় হইলে, ঘনশ্যামই কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন করিয়া তাহাকে আরোগ্য করে। তাহাতে সেই মাড়োয়ারী মহাজন ঘনশ্যামকে অনেক টাকা দিয়াছে এবং এখনো মধ্যে মধ্যে টাকা গহনা যখন যাহা চাহিতেছে তাহাই দিতেছে। ইহারই মধ্যে ঘনশ্যাম তিন চারি বার তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিয়া তাহাদের গ্রামের অনেক লোকের ধানের জমি কিনিয়া লইয়াছে, এবং ত্রিপুরাচরণের পরিত্যক্ত ভিটা তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া সেখানে বাস করিতেছে। মা কালী তাহাকে সদ্য সদ্য জমিদার করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সে এখন কালী-ভক্ত হইয়াছে। ত্রিপুরাচরণের বাটী সংস্কার করিয়া তাহারই একটী কক্ষে ঘনশ্যাম কালী-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছে এবং প্রচার করিয়াছে কালীমা তাহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া নিজেই সেখানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ত্রিপুরাচরণের বাটীর সে এখন নাম দিয়াছে "কালী বাড়ী"।

ইহারই মধ্যে ঘনশ্যামের জাগ্রতা কালীর খ্যাতি এরূপ প্রচারিত হইয়াছে যে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোকে তাহার কালীবাড়ীর পূজা দিতে আসিতেছে। ঘনশ্যাম নিজেই পূজা ও বলিদান করে। কালী-স্থাপনায় তাহার, ইহারই মধ্যে বেশ আয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব দৈন্যের ও চরিত্রহীনতার কথা চাপা পড়িয়া লোকের কাছে তাহার কালীসাধক বলিয়া সুনাম হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার কন্যার মল্লিকপুরের চক্রবর্ত্তীদের বাটীতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তদুপলক্ষে তাহার মুরুব্বী মাড়োয়ারী মহাজনই তাহাকে সেই বিবাহের সমস্ত গহনা ও খরচ দিয়াছে। ঘনশ্যাম নিজে কলিকাতায় গিয়া সেই সমস্ত লইয়া আসিয়াছিল।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে সুবোধ জানিতে পারিল যে রামকানাইপুরে ঘনশ্যামের মিত্রের অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যাই অধিক। ঘনশ্যাম যাহাদের জমি বাকিখাজনার নিলামে ক্রয় করিয়া লইয়াছে বলিয়া, তাহারা সকলেই ঘনশ্যামের বিপক্ষ। তদ্ব্যতীত হঠাৎ অবস্থার উন্নতি হওয়াতে সে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের আর গ্রাহ্যই করে না, সেই জন্য তাঁহারা সকলেও ঘনশ্যামের উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু ত্রিপুরাচরণের জ্ঞাতি ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গেই ঘনশ্যামের বিবাদ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞাতির ভিটা একজন নিঃসম্পর্কীয় লোক আসিয়া দখল করায় ত্রৈলোক্য

অত্যন্ত মঃনক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সে অনেক আপত্তি করে। ঘনশ্যাম সে আপত্তি গ্রাহ্য করে নাই; সে বলিয়াছিল, যখন ত্রিপুরাচরণের স্ত্রী তাহাকে সে বাটী বিক্রয় করিয়াছে, তখন ত্রৈলোক্য আপত্তি করিবার কে? ত্রৈলোক্যর অর্থাভাব, সুতরাং সে মকর্দ্দমা করিয়া ঘনশ্যামের সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিবে না বলিয়া কিছু করিতে পারিতেছে না; কিন্তু সে ঘনশ্যামের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া আছে।

... ...দ অবগত হইয়া সন্দেহ বদ্ধমূল হইল যে সবিত্রীর নিকট হইতে টাকা ও গহনা লইয়া ঘনশ্যামের কালীঘাট হইতে অন্তর্ধ্যান হওয়ার সহিত সাবিত্রীদের নিরুদ্দেশ হইবার একটা সংস্রব আছে। কিন্তু ইন্দুর বিবাহ দিবার সময় সাবিত্রী যে এমন কি কথা গোপন করিয়াছিলেন যাহার জন্য সাবিত্রীকে নিরুদ্দেশ হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং ঘনশ্যামই বা কি উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদই সুবোধ সংগ্রহ করিতে পারিল না। সুবোধ রামকানাইপুরের নিকট আড়মডাঙ্গায় বাসা লইয়াছিল। রামকানাইপুরে থানা নাই, থানা আড়মডাঙ্গায়। আড়মডাঙ্গার সবইন্স্পেক্টার শশধর বাবুর নামে সুবোধ পরিচয় পত্র আনিয়াছিল। শশধর বাবু অতি সজ্জন লোক, তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া সুবোধকে আশ্বাস দিয়াছিলেন

যে তাঁহার দ্বারা যতদূর সাহায্য হইতে পারে তাহা তিনি করিবেন। সুবোধের মনে ধারণা হইয়াছিল যে ঘনশ্যাম সাবিত্রীদের ঠিকানা জানে, কিন্তু হয়ত সে কথা সে স্বীকারই করিবে না, এবং সুবোধ যে সেই সংবাদ পাইবার জন্য ব্যগ্র, সে কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, ঘনশ্যাম হয়ত যাহাতে সুবোধ সেই সংবাদ না পায় তাহারই চেষ্টা করিবে। সুতরাং ঘনশ্যামকে কি উপায়ে সেই সংবাদ দিতে বাধ্য করিতে পারিবে, সুবোধ তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুবোধ কলিকাতা হইতে গুরুচরণ ও দামিনীকে লইয়া আসিয়া অন্তরাল হইতে ঘনশ্যামকে দেখাইয়া, তাহাদের কথিত কালীঘাটের সেই কাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ এবং ঘনশ্যাম যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে নিশ্চিত হইল। সুবোধের মনে সন্দেহ হইয়াছিল, ঘনশ্যাম যে সকল গহনা তাহার কন্যাকে বিবাহের সময় দিয়াছে সেই গহনা গুলি ইন্দুর হইতে পারে। দামিনী সেই সমস্ত গহনা দেখিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় দেখিলে সে চিনিতে পারিবে এই ভাবিয়া সুবোধ দামিনীকে মল্লিকপুরে পাঠাইল। মল্লিকপুরে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে; সেই দীর্ঘিকায় গ্রামের সকল বাটীর স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে আইসে। দামিনী সেই দীর্ঘির ঘাটে গিয়া মল্লিকপুরের একজন নিম্নজাতীয় পল্লীবধূর সহিত আলাপ করিয়া, তাহারই সাহায্যে একদিন ঘনশ্যামের কন্যা দীর্ঘি-

কায় স্নান করিতে আসিলে, তাহার গায়ের অলঙ্কারগুলি কৌশলে দেখিয়া আসিল। সে আসিয়া সুবোধকে বলিল, সমস্ত গহনাই ইন্দুর, গহনার মত—গলার হার ও হাতের চুড়ি যে ইন্দুর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; নমুনার বহি দেখিয়া নমুনা হইতে একটু প্রভেদ করিয়া, ইন্দু সেই গহনা গুলি গড়াইয়াছিল। বাদুড়বাগানের মতি স্বর্ণকার সেই সমস্ত গহনা গড়িয়াছিল; সে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। সুবোধ মতি স্বর্ণকারকেও আড়মডাঙ্গায় আনাইল, এবং কলিকাতায় গিয়া ধন্নুলাল আগরওালার অনুসন্ধান করিল ও কালীঘাটে তাহার পুত্রের মঙ্গলের জন্য ঘনশ্যাম যে স্বস্ত্যয়ন করিবার কথা প্রচার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধেও বিশেষ তত্ত্ব লইল। ঘনশ্যামের ও সাবিত্রীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও সাবিত্রীর নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি এবং ঘনশ্যামকে দেখিয়া, অথবা তাহার মুখে কোন কথা শুনিয়া, ইন্দু কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিল, সে বিষয়ে সুবোধ কোনও সংবাদ পাইল না। শেষে সুবোধ দেখিল ঘনশ্যামের নিকট হইতে কৌশলে সেই সংবাদ বাহির করিতে না পারিলে অন্য উপায়ে তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। তখন সুবোধ সেই কৌশলই অবলম্বন করিল। শশধর বাবু তাহার সহায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈকালে ঘনশ্যাম তাহার "কালীবাড়ী"র সম্মুখের রোয়াকে কয়েকজন অনুগত প্রতিবেশীর সহিত বসিয়া অন্য দিনের মত গঞ্জিকাসেবন ও আত্মমহিমা প্রচার করিতেছিল। তাহার ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র, গলায় নকল রুদ্রাক্ষের মালা। তাহার নিকটে বসিয়া একজন করতলে গঞ্জিকা মর্দন করিতেছিল। ঘনশ্যাম এক এক বার তাহাকে তাড়া দিয়া বলিতেছে, "কি ছিদাম ছিলিমটা তৈরী হলো? নাও, এইবার কল্কেয় চড়িয়ে ফেল—বাবাকে নিবেদন করে দিই," এবং এক একবার রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠে, গলদেশের শিরা উপশিরা স্ফীত করিয়া তারস্বরে গাহিতেছে—

"দে মা আমায় তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥"

শ্রীদাম গঞ্জিকার কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বলিল, "নাও গো দাদাঠাকুর, ধর।" ঘনশ্যাম কলিকাটী একটি ক্ষুদ্র হুঁকায় বসাইয়া তিন চারিবার সজোরে টান দিয়া,

শ্রীদামকে প্রসাদ পাইতে কলিকাটী প্রত্যর্পণ করিল। পরে বদনগহ্বর হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গার করিয়া পুনরায় উচ্চতর কণ্ঠে গায়িল—"দে মা আমায় তবিলদারী" ইত্যাদি। শ্রীদাম সেই সময়ে গঞ্জিকার কলিকা মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া এমন এক টান দিল যে কলিকার অগ্নি দীপ-শিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী গোয়ালা এতক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে কলিকাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল; এক্ষণে গঞ্জিকা ভস্মসাৎ হওয়াতে সে নৈরাশ্য-পীড়িত হইয়া শ্রীদামকে বলিল—"বলি আচ্ছা লোক ত! এ কল্‌কেটাও একেবারে জ্বালিয়ে দিলি! ঢের ঢের গেঁজেল দেখেছি বাপু—কিন্তু এর জুড়ি মেলা ভার—একেবারে রূপচাঁদ পক্ষী। তু তু ছিলিম সাবাড় কর্‌লে!" ঘনশ্যামের নেশায় স্ফূর্ত্তি আসিয়াছিল। সে উদার ভাবে বলিল—"চট কেন হে ঘোষের পো? এই নাও আর এক ছিলিম ধাঁ করে তৈরী করে ফেল। কালী করালবদনি! এই নাও—তারা ব্রহ্মময়ি!" এই কথা বলিয়া সে তাহার কটীদেশের বস্ত্র হইতে গঞ্জিকার মোড়ক বাহির করিয়া চণ্ডী ঘোষের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

এমন সময় রামসর্ব্বস্ব মণ্ডল একখানি ক্ষুদ্র খড়্গা হস্তে করিয়া আনিয়া, ঘনশ্যামের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল,

"এই নাও দাদা ঠাকুর, তোমার খাঁড়া নাও। এবার যেদো কামারকে দিয়ে ধার দিয়ে এনেছি।" এই কথা বলিয়া সে ঘনশ্যামকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "দেখো দাদা ঠাকুর, আমার ভোঁদার যেন কোন অমঙ্গল না হয়,— আমি মা কালীকে সোণার বিল্ব-পত্তর গড়িয়ে দেব।"

শ্রীদাম জিজ্ঞাসা করিল—"কেনরে, হয়েছে কি?"

রামসর্ব্বস্ব কহিল "ভারি সর্ব্বনেশে কাণ্ড হয়ে গেছে গো। আমার ভোঁদার ব্যামোর সময় মা কালীকে পাঁঠা দেব মেনে ছিলাম, জান ত? তা আজ সেই পাঁঠা বলি দিতে এনে ছিলাম। তা কি আর বলবো গো, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে— বলিদানে বাধা পড়ে গেছে।"

ঘনশ্যামের নর্ম্মসচিব হরকালী ভট্টাচার্য্য মদ্য পান করিয়া ঈষৎ মত্ত হইয়া বসিয়াছিল। সে এক্ষণে কৌতুক অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি রে! কোপ্ করেছিল কে?"

রামসর্ব্বস্ব কহিল, "তা দাদা ঠাকুর নিজেই করেছিলেন। আমার বরাত—"

হরকালী রহস্যচ্ছলে বলিল, "মুড়িটা ত ঘনশ্যামের পাওনা! তাই বুঝি কাঁধ ঘেঁসে কোপ্ ঝেড়েছিল রে?"

রামসর্ব্বস্ব সরল ভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে তা কেন হবে? কাতান খানা ভোঁতা ছেল। মুড়িটা ডাগর করে কেটে

নিলে ত আমার কোন 'দুঃখু ছেলনা—উনি কেন গোটা ধড়টা মুড়ি ব'লে নিয়ে আমার হাতে খালি লেজ টুকু কেটে দিলেন না। তাতে ত কোন গোল হত না ?—পাঁঠাটার বলি বেঁধে গিয়ে ছেলেটার পাছে অমঙ্গল হয়, এই ভাবনা।"

হরকালী। "পাঁঠাটা বুঝি খেড়ে ছিল ?—পাকা গর্দ্দান কি সহজে কাটে !

ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল, "আরে না না ভট্চায—সেটা একটা বেরাল-বাচ্ছা বল্লেই হয় ! সে দিন গেরো বাগ্দী কি রকম পাঁঠাটা বলি দিতে এনেছিল দেখে ছিলে ত ?"

শ্রীদাম বলিল, "উনি দেখেন নি—আমি দেখেছি। ওঃ সে একটা মস্ত বোকা পাঁঠা—বাছুর বল্লেই হয়।"

ঘনশ্যাম সগর্ব্বে কহিল, "সেটাকে ঐ খাঁড়াতেই এক কোপে সাবড়ে দিয়েছিলুম—দেখেছিলি ত ? ও বেটার মনে কোন গোল ছিল। নইলে ঐ টুকু বেরাল ছানার মত ছাগলটাকে তিন তিন কোপ ঝাড়লুম শালার ঘাড়ে একটা আঁচড়ও বস্‌ল না।"

হরকালী। তা শেষে কি পুঁচিয়ে জবাই করলে না কি ?

ঘনশ্যাম। নইলে করি কি ? মন খুলে পূজো দিলে কি আর এমন ব্যাঘাত হয় ?

রামসর্ব্বস্ব ক্ষুণ্ণস্বরে কাতরভাবে কহিল, "দোহাই বল্‌ছি দাদা ঠাকুর—আমার মনে কোন ঘোর প্যাঁচ ছেল না।"

ঘনশ্যাম কহিল, "যা যা বেটা বেল্লিক। আমার কাছে চালাকি করিস্ নি—বেটার টাকায় ছাতা ধরছে—আর কি না দশ গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটা মড়াখেগো পাঁঠার বাচ্ছা কালী-বাড়িতে বলি দিতে এনেছিলি? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমার সঙ্গে মা কথা কন্ তা জানিস্—আমার সঙ্গে চালাকি?"

রামসর্ব্বস্ব জোড়হাত করিয়া কহিল, "দোহাই দাদা ঠাকুর, এবার আমায় রক্ষে কর। আর এমন কাজ করব না? এই নাক কাণ মলছি। জোড়া পাঁঠা দেব—এবার দুটো রামছাগল এনে হাজির করব—সোণার বিল্ব-পত্তর দেব।"

ঘনশ্যাম প্রীত হইয়া কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি যা বলি তা শোন্—ও সব জোড়া পাঁঠা টাঁঠার হাঙ্গামে আর কাজ নেই—সোণার বিল্ব পত্তর দিস্ আর পূজোর দক্ষিণেটা মোটা করে দিস্, তা হলেই হবে—এখন যা। তারা ব্রহ্মময়ী! কি হল হে চণ্ডী, ছিলিমটার কত দূর?", অগত্যা রামসর্ব্বস্ব বিদায় লইল।

চণ্ডী গোপ ইতিমধ্যে গঞ্জিকা তৈয়ারী করিয়া, ঘনশ্যামকে কথায় কথায় অন্যমনস্ক দেখিয়া, সবেমাত্র গোপনে একবার টান দিয়াছিল। সে শশব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই যে কলকে চড়িয়েছি নেন্ পেসাদ করে আমাকেই দেবেন্।"

সেই সময়ে হরকালী তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে লুকায়িত দেশীয় মদ্যের একটী বোতল বাহির করিয়া ঘনশ্যামকে

দেখাইয়া বলিল, "হাদে এদিকে দেখ।" ঘনশ্যাম মদ্যের নেশায় নূতন দীক্ষিত হইয়াছিল ; হরকালীর কাছেই তাহার হাতে খড়ি। শিশুরা নূতন খেলনা দেখিলে যেরূপ আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠে, ঘনশ্যামও সেই মদের বোতলটী দেখিয়া সেইরূপ ব্যগ্রভাবে বলিল, "এনেছ ? বেশ্ বেশ্ এদিকে দাও কারণ-বারি না টান্‌লে কি কালীসাধনা হয় ?" এই কথা বলিয়া ঘনশ্যাম মদ্যের বোতলটী লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "এ কি হে ভট্‌চায্ আধখানাও নেই যে, এর মধ্যে এতটা সাবাড় করে ফেলেছ ? দাও গেলাসটা দাও।" ঘনশ্যামকে মদ্য পানে ব্যস্ত দেখিয়া হরকালী চণ্ডীর হস্ত হইতে গাঁজার কলিকাটী লইয়া টানিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু ঘনশ্যামের সেদিকে দৃষ্টি পড়াতে সে বলিয়া উঠিল. "ও কি কর হে ভট্‌চায্ ? আমাকে আগে দাও।"

হরকালী ব্যঙ্গ-স্বরে বলিল, "এতক্ষণ ত ডাঙ্গা আগ্‌লে ছিলে. এখন জলপথে নেমেছ, আবার ডাঙ্গার দিকে চাও কেন বাবা ?"

ঘনশ্যাম কহিল, "যাও যাও, মিথ্যে বাজে বোকোনা ভট্‌চায নিজে কি করছ ?"

হরকালী হাসিয়া উত্তর দিল, "আমরা বরাবরই উভচর—বকেয়া হাঁস ; তুমি যে এই সবে জলে নেবেছ, দুদিক সাম্‌লাতে পারবে কেন চাঁদ ? মাথায় আগুণ চড়্‌বে যে।"

"আরে মিছে বেল্লিক মো কোরোনা" এই কথা বলিয়া ঘনশ্যাম হরকালীর হস্ত হইতে কলিকাটী কাড়িয়া লইল এবং তাহার ক্ষুদ্র হুঁকায় আঁটিয়া বসাইয়া দুই তিনটী টান দিল। পরে পূর্ব্বের মত বদনাভ্যন্তর হইতে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে কলিকাটী হরকালীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তারস্বরে হাঁকিল, "তারা ব্রহ্মময়ী! শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে! নাও ভট্টচায, দুটান টেনে চণ্ডীকে দাও।"

এমন সময়ে রামকানাইপুরের সাত আট জন ভদ্রলোক, এবং ত্রিপুরাচরণের জ্ঞাতি ত্রৈলোক্যর সহিত সুবোধ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে তাহাদের আসিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ তাহার পরম শত্রু ত্রৈলোক্য একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আনিতেছে দেখিয়া, ঘনশ্যাম কিছু বিস্ময়াবিষ্ট এবং তাহার নেশার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনায় বিরক্তও হইল। নিকটে আসিয়া ত্রৈলোক্য অঙ্গুলিদ্বারা ঘনশ্যামকে নির্দ্দেশ করিয়া সুবোধকে বলিল, "এরই নাম ঘনশ্যাম, এ-ই আমাদের ভিটেয় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।"

ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "যা য বেটা হাড়-হাবাতে, তোর বাবার ভিটে। যার ভিটে সে নিজে বিক্রী করেছে, উনি তার মাসীমার কুটুম এসেছেন ভিটের দাবী করতে! যা না আদালত ত খোলা আছে, যা না একবার নালিস্ করে দেখ্ না দেখি, তুই কত বড় বাপের বেটা।"

ত্রৈলোক্যও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এখন যা এসেছে তার হুড়ো সামলা বেটা ভণ্ড পাষণ্ড। তারপর আমার সঙ্গে মামলা করিস্। তোর ধনু আটাওলা না ভুনোওলা আছে বলে কি গরিবের মা বাপ নেই? দর্পহারী মধুসূদন এইবার তোর দর্প [illegible]। ইনি পুলিসের লোক, সাবধানে কথা কস্।"

[illegible] ভাবে উত্তর দিল, "পুলিসের লোক তা হয়েছে কি? [illegible] লোককে তুই বেটা ছিঁচকে চোর ভয় করগে যা। [illegible] দাই কাঁশী বাবাই—মা কালীর জোর ধরে পড়ে আছি। [illegible] পুলিসের লোকের কি তোয়াক্কা রাখি?" পরে সুবোধের [illegible] চাহিয়া, তাহার ভদ্রবেশ দেখিয়া, কিছু নম্রস্বরে বলিল, "[illegible] মশায় বসুন। তারা ব্রহ্মময়ী হক্ কথা কইব তা [illegible] মহাদেবকেও ডরাই না—কি বলেন মশাই? তার [illegible] মনে করে মশায়ের এখানে আসা হয়েছে?"

সুবোধ গম্ভীর [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম ঘনশ্যাম?"

ঘনশ্যাম কহিল, "[illegible] হাঁ।"

সুবোধ প্রশ্ন [illegible] "তুমিই ভবানীপুরের চেলোপটি নিস্তারিণী বাড়ী[illegible]বাড়ীতে থাকতে? সত্য কথা বলো নইলে পাঁচে

ঘনশ্যাম চিন্তিত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেখানে কিছুদিন ছিলাম বটে "

সুবোধ কহিল, "তোমার নামে চুরীর দাবী আছে। যার জিনিস সে ধর্ম্মভীরু লোক, বামুনকে হট্ করে হাজতে দিতে চায় না, তাই তোমার যদি কিছু সাফাই জবাব থাকে তাই জানতে এসেছি।"

ঘনশ্যাম ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কি চুরী—কার জিনিস শুনি? ব্রাহ্মণের নামে এমন বদ্‌নাম! মা কালী করালবদনী তুমি আছো!"

সুবোধ অবিচলিত ভাবে কহিল, "তোমার মেয়েকে বিয়ের সময় যে সব গয়না দিয়েছ সে সব চোরাই মাল।"

ঘনশ্যাম সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, মিথ্যে কথা। সে সব গয়না আমাকে ধন্নলাল আগরওয়ালা দিয়েছে।

সুবোধ কঠোর স্বরে কহিল, "খবরদার্। আমার সঙ্গে চালাকী করো না হাতে হাতকড়ি পড়বে—পুলিস মোতায়েন আছে।" এই কথা বলিয়া অজিত পকেট হইতে একটী হুইসিল্ বাহির করিয়া বাজাইতেই, অদূরে পথিপার্শ্বের একটী ঝোপের অন্তরাল হইতে আড়ম্‌ডাঙ্গা থানার চারিজন চৌকীদার এবং একজন দারোগা বাহির হইল। তাহাদের দেখিয়া ঘনশ্যামের এক কলিকার ইয়ারগণ যে যে দিকে পারিল ধীরে

ধীরে সরিয়া পড়িল। ঘনশ্যাম কিছু ভীত হইয়া পুনরায় বলিল "আমি মিথ্যে বলছি না।"

সুবোধ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "হাটখোলার ধন্নুলাল আগরওয়ালা বলে কোন মহাজন নেই। আর তোমার মেয়ের গায়ে যে সব গয়না আছে, সেই সব গয়না যার হাতে গড়া সেই সেক্‌রা এসে সনাক্ত করে গেছে।"

ঘনশ্যাম চিন্তিতভাবে উত্তর দিল "যার গয়না সেই আমাকে দিয়েছে।"

সুবোধ। গয়না বাদুড় বাগানের ডাক্তার অজিত মুখুর্য্যের স্ত্রীর

ঘনশ্যাম অজিত মুখুর্য্যে কে? আমি তাকে চিনি না গয়না আমাদের ত্রিপুরো দাদার মেয়ের।

সুবোধ। সেই ত্রিপুরাচরণের কন্যাকেই অজিত বি করেছে।

ঘনশ্যাম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া উত্তর দিল, বিলক্ষণ! হিঁ ঘরের মেয়ের কটা বিয়ে হয়? তার ত এই গাঁয়েই দিগ গাঙ্গুলরী সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছিল।

সেই কথা শুনিয়া গ্রামের যে সকল ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থি ছিল, তাহারা সকলেই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহি দেখিল, এবং ত্রৈলোক্য বলিয়া উঠিল, "শোন কথা! দিগ গাঙ্গুলী ত আজ ১৫।১৬ বছর মারা গেছে। ত্রিপুরো কাকাও

তাঁর বাপ অনেক আগেই মারা যান, আর কাকিমা তার পরেই তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান, তবে এখানে বিয়ে হোল কি করে!

ত্রৈলোক্যর প্রতিবাদে ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই বেটা থাম, তোর তখন গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তুই তার জানবি কি?"

ত্রৈলোক্য উত্তর দিল, "না—আমার তখন বিশ বছর বয়েস, বিয়ে হলে আমি টের পেতাম না?"

ঘনশ্যামের কথা শুনিয়া অজিতের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় সুবোধ, কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রৈলোক্যর কথায় সে একটু সাহস পাইয়া গ্রামের অপর সকল উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মশায়, আপনারা সে বিয়ের কথা কিছু জানেন?"

তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলিল, "ত্রিপুরা-চরণ মারা যাবার মাসছয়েক আগে দিগম্বর গাঙ্গুলী এখানে এসে একবার পাঁচ সাতটা বিয়ে করে যায় বটে; কিন্তু ত্রিপুরার কচি মেয়েকেও যে সে বিয়ে করেছিল, তা'ত তখন শুনি নি।"

ঘনশ্যাম কহিল, "ওঁরা জানবেন কি করে? ত্রিপুরো দাদা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লুকিয়ে সে বিয়ে দিয়েছিলেন।

বৌ ঠাকরুণ কান্নাকাটি করেছিলেন, আর টাকা বাঁচার জন্যে দুধের মেয়েকে আশী পঁচাশী বছরের বুড়োর সঙ্গে দেওয়াও একটা লজ্জার কথা বলে ত্রিপুরোদাদা আর কথাটা প্রকাশ করেন নি।"

ত্রৈলোক্য উত্তেজিত ভাবে কহিল, "আরে তিনি নাই বা প্রকাশ কর্‌লেন, বাড়িতে বিয়ে হলে আমরা বাড়ির লোকে টের পেতাম না? খ্যাপার মত যা তা বল্‌লেই হ'ল।"

ঘনশ্যাম তীব্রভাবে উচ্চকণ্ঠে কহিল, "চোপ্ রও, খ্যাপা খ্যাপা করিস্‌নি। ফের্ যদি খ্যাপা বল্‌বি ত তুই আছিস্ কি আমি আছি! এবাড়িতে কি বিয়ে হয়েছিল রে বেটা আঁটকুড়ীর পুত? বিয়ে হয়েছিল ঘোষালদের বাড়িতে—তা তুই জানবি কি?"

ত্রৈলোক্য সে কথায় কিছু মাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া উত্তর দিল, "আমি জানি কাকিমা যত দিন এখানে ছিলেন, তিনি এক দিনও বাড়িথেকে নড়েন্ নি। ঘোষালদের বাড়িতে আবার তিনি কবে মেয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিতে গেলেন? সব মিথ্যে কথা। এই আমি যাচ্ছি। যদু ঘোষালকে ডেকে আন্‌ছি। তোর মিথ্যে বলা ভেঙ্গে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া ত্রৈলোক্য দ্রুতপদে ঘোষালদের বাড়ির দিকে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে নিষ্ফল ক্রোধে, গঞ্জিকার ও মদের দ্বিবিধ নেশায় আরক্তিম চক্ষুর্দ্বয়

বিঘূর্ণিত করিয়া ঘনশ্যাম তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "বেটার নেহাত মরণ ছিট্‌পিট্‌নি ধরেছে দেখছি।"

সুবোধ এতক্ষণ চিন্তিত ভাবে উক্ত বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিতেছিল। ইন্দুর পূর্ব্ব-বিবাহের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অজিতের প্রাণে কি ভীষণ আঘাত লাগিবে, সেই চিন্তায় সুবোধ মনের চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিতেছিল না। এক্ষণে কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়া সে ঘনশ্যামকে বলিল, "যাক্ সে বিয়ে যদি হয়েই থাকে, তাতেও কিছু মিটছে না। অজিত মুখুর্য্যে যখন ত্রিপুরাচরণের কন্যাকে বিবাহ করে, তখন ত আর দিগম্বর গাঙ্গুলী বেঁচে ছিল না? অজিত না হয় বিধবাকে বিয়ে করেছে। বিধবা বিবাহ ত আইনে বাধে না? তাহলেই অজিতেরই স্ত্রীর গয়না তুমি চুরী করে এনেছ। তোমার কথা সত্য হলেও সে দাবী বজায় রয়েছে।"

ঘনশ্যাম চিন্তিত ভাবে উত্তর দিল, "বলেছিত, সে মেয়ে নিজে আমাকে সে গয়না বেচেছে।"

সুবোধ অবজ্ঞার স্বরে কহিল, "বেচেছে! তুমি টাকা পেলে কোথা?"

ঘনশ্যাম সে কথার প্রতিবাদ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুবোধ সে কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তুমিত কালীঘাটে কাঙ্গালীবৃত্তি করতে—মিছে কথা বাড়িওনা। অজিতের চাকর

আর ত্রিপুরার পরিবারের বাড়ীতে যে দাসী ছিল, তারা দুজনে, তোমাকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে।"

ঘনশ্যাম কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা সত্যি কথাই যদি বলি; তাতেই বা কি আসে যায়? বেচোন, আমাকে অমনি দিয়েছে—ফেরে পড়ে দিয়েছে, আগেকার বিয়েটার কথা যদি বলে দিই সেই ভয়ে দিয়েছে—আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে দিয়েছে।"

সুবোধ তাহাই অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু সে নিজের মনোভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, "তোমার মুখবন্ধ যদিই করলে, তবে অজিতের ঘর করতে গেল না কেন?"

ঘনশ্যাম উত্তর দিল, "সেটা আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। তার পরে জেনেছি সেটা মেয়েটার খেয়াল্। যদি আগের বিয়ের কথাটা এরপরে জানাজানি হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে নিয়ে ঘর করেছে বলে অজিত বাবু ফ্যাঁসাদে পড়ে যাবে ত? তা সেটা সে চায়না? নিজে মরছে সে ভাল তবু অজিত বাবুর গায়ে আঁচড়টী লাগতে দেবে না—এই মতলব! সাধে বলে মেয়ে বুদ্ধি! এমন কি, কথাটা যে অজিতবাবুর কাণে যায় তাও সে চায় না; তাই ত আমাকে টাকা গয়না দিয়ে আসছে—নইলে মেয়েমানুষের হাত দিয়ে জল গলে?"

সুবোধ কথা দিয়া কথা বাহির করিবার আশায় কহিল,

"তা হ'লে তুমি বলতে চাও যে 'এই টাকাকড়ি গয়না পত্তর যা তুমি এনেছ—সব সে নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছে ? একথা তাকে আদালতে হাজির ক'রে বলাতে পারবে ? নইলে অজিত মুখুর্য্যে তোমার মুখের কথা শুনেই কি তোমাকে ছেড়ে দেবে মনে করেছ ? হাজতে ঠেলবে তা বলে দিচ্ছি।"

ঘনশ্যাম আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক কোনও কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। সে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "সে কথা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পারেন ? তাকে হাজির করতে পারব না।"

সুবোধ বিস্মিত ভাবে কহিল, "কেন ? তার নামে যদি পরোয়ানা বার করি ?"

ঘনশ্যাম। "পরোয়ানাই বের করুন, আর যাই বের করুন—সে হাজির হতে পারবে না।"

সুবোধ শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

সুবোধের আগ্রহ দেখিয়া ঘনশ্যাম তাহার সেই পরাজয়ের সময়ও যেন একটা জয়ের উল্লাস অনুভব করিল। সে একটা বিকটহাস্য দমন করিয়া বলিল, "কেন ? তা সেখানে গেলেই টের পাবেন ?"

সুবোধ তাহার মনের আশঙ্কা গোপন করিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই হবে—তাদের ঠিকানা ?"

ঘনশ্যাম পুনরায় কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "সেই কথাটাই বলতে বারণ ছিল—তা যখন ছাড়বেন না, সবই বলতে হ'ল—তখন সেটাই বা বাকি থাকে কেন? বলে ফেলি—তারা কাশীতে, গণেশ মহল্লায়—গলিতে—নং বাড়ীতে থাকে।

সেই সময়ে ত্রৈলোক্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে যদুঘোষালকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "এই শুনুন এঁর মুখে। সব মিথ্যে কথা। ওঁদের বাড়ীতে যেদিন ওঁর ভাইঝিদের সঙ্গে দিগম্বর গাঙ্গুলীর বিয়ে হয়, সেইদিন রাত্তির দুপুরের সময়, ও ত্রিপুরো কাকার ক্ষুদে মেয়েটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোলে করে নিয়ে ওঁদের বাড়িতে বিয়ে দিতে হাজির হয়েছিল বটে, কিন্তু সে মেয়ে জেগে উঠেই আছাড় পাছাড় করে এমন চীৎকার করতে লাগল—যে দিগম্বর গাঙ্গুলী রেগে আগুন হয়ে ওকে বললে—"নিয়ে যাও মেয়েটাকে এখান থেকে—কটা টাকার জন্যে ঐ মেয়েকে যদি আমি বিয়ে করি ত আমার নাম দিগম্বর গাঙ্গুলী নয়। মেয়ের কান্নাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সবাই ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ত্রিপুরো কাকা ত বাড়ীর ভেতর মেয়েদের কাছে যান নি—ও বোধ হয় বাইরে এসে বিয়ে হয়ে গেছে বলে ফাঁকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা কটা হাতিয়েছিল। ওর অসাধ্যি ত কোন কাজই নেই; তার পরদিনই দিগম্বর এখান থেকে দেশে ফিরে যায়—বিয়েও হয় নি কিছুই হয় নি।' এই

যদু বাবুকে জিজ্ঞেস করুন। ওঁর ভাইঝিরা—যাঁদের সে রাত্রে বিয়ে হয়, তাঁরাও রয়েছেন—জিজ্ঞেস করবেন চলুন না।"

সেই কথা শুনিয়া সুশোভনের বক্ষ হইতে যেন একখানা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল—"তা হলে অজিতের স্ত্রীর গয়না টাকাগুলো সব ঠকিয়ে এনেছে? চুরি করেনি, ঠকিয়ে এনেছে—এই কথা!"

ত্রৈলোক্য। "তা নয়ত কি? ওর সবই মিথ্যা।"

ত্রৈলোক্যর আগমনে ঘনশ্যাম মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে ত্রৈলোক্যর বাক্যে সে একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। পঞ্চমারের ও সুরার মাদকতা তাহার মস্তিষ্কে উঠিয়াছিল—সে ক্রোধে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিল, "তবে রে বেটা পাজি—তুই-ই যত নষ্টের গোড়া—দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ঘনশ্যাম, রামসর্ব্বস্ব মণ্ডলের আনীত সেই শাণিত খড়্গ তুলিয়া, ত্রৈলোক্যর মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে আঘাত করিল। ত্রৈলোক্য ঈষৎ সরিয়া গিয়াছিল, খড়্গ তাহার মস্তকে লাগিল না, স্কন্ধের উপর খড়্গের অগ্রভাগ মাত্র পতিত হইল—নতুবা ত্রৈলোক্যর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। কিন্তু স্কন্ধের আঘাত এরূপ গুরুতর হইল যে তাহাতেই রক্তাক্ত কলেবরে জ্ঞানশূন্য হইয়া

ত্রৈলোক্য ভূমিতে পড়িয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সুবোধ ঘনশ্যামকে সাপটিয়া ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল এবং গ্রামের লোকেরা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ত্রৈলোক্যর ক্ষতস্থান যথাসাধ্য বন্ধন করিয়া সুবোধ অবিলম্বে তাহাকে চিকিৎসার জন্য আড়ম্ডাঙ্গায় সরকারী চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিল এবং থানার লোকেরা, মারাত্মক আঘাতের অপরাধে, ঘনশ্যামকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। পরদিন চিকিৎসালয়ে গিয়া সুবোধ অবগত হইল, ত্রৈলোক্যর আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও তাহার আরোগ্য হইতে বহুদিন লাগিবে। সে যতদিন না আদালতে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হয়, ততদিন ঘনশ্যামকে হাজতে থাকিতে হইবে। গ্রামের কোনও সঙ্গতিপন্ন লোক ঘনশ্যামের প্রতিভূ থাকিতে সম্মত হয় নাই। এমন কি তাহার বৈবাহিক মল্লিকপুরের চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অবধি, তাহার প্রবঞ্চনার কথা জানিতে পারিয়া, জামিন হইতে অস্বীকার করিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া সেই দিনই সুবোধ আড়ম্ডাঙ্গা ত্যাগ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৎপরদিন সুবোধ কলিকাতায় আসিয়া অজিতকে সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে জ্ঞাপন করিল। অজিত স্থিরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে সুবোধকে বলিল, "ভাই, আজই রাত্রের গাড়ীতে আমায় কাশী যেতে হবে—তুমিও সঙ্গে চল।" অজিত এত সহজ ভাবে কথাগুলি বলিল যে সুবোধ বুঝিতে পারিল না, অজিতের অন্তরে কি ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বহিতেছে।

অজিতের বাহ্যিক ধৈর্য্য দেখিয়া প্রীত হইয়া সুবোধ বলিল, "আমি মনে করেছিলুম কাশীতে তুমি একলা গেলেই হবে, এ সময়ে আমি আড়ংডাঙ্গায় ফিরে গেলে তোমার স্ত্রীর গয়নাগুলো আর শাশুড়ীর টাকাগুলোর কতক ফিরিয়ে পাবার উপায় করতে পারতুম। এর পরে সব আদায় না হতে পারে। আর ঘনশ্যামটা যা করে বসেছে তাতে বছর দুই ত বাছাধনকে শ্রীঘর বাস করে আসতেই হবে—তবে আমি থেকে মকর্দ্দমা তদ্বির করলে আরো কিছু বেশী সাজা দেওয়াতে পারতুম।"

সেই কথা শুনিয়া অজিত আর তাহার মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিল না। সে গাঢ়স্বরে বলিল "ভাই যার জন্যে ভাবনা

তাকেই আগে পাই—তার পর সেই টাকার কথা বোলো। সাক্ষী যিনি যাকে যা দেবার তিনিই দেবেন—সে জন্যে আমাদের এখন ব্যস্ত হবার দরকার নেই—তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।"

অজিতের ব্যগ্রতা ও মুখের শঙ্কিত ও ব্যথিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সুবোধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং সমবেদনায় চঞ্চল হইয়া অজিতের কথাই রক্ষা করিল। সেই রাত্রের পাঞ্জাব মেলে উভয়ে কাশী যাত্রা করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল। অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি গুরুচরণ যাহা পারিল গুছাইয়া দিল। অজিত প্রচুর অর্থ সঙ্গে লইল। যখন সে বলিয়াছিল, ইন্দু কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে আসিতে পারিবে না, সেই কথাটাই, কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায়, অজিতকে এক একবার ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু ইন্দু যে তাহার মৃত্যুর খবর দিয়া অজিতের মান রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল—সে যে নিজের চেয়ে অজিতকে ভালবাসে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া অজিত আজ ইন্দুকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে অপর কোনও চিন্তাই তাহার মনে স্থান পাইতেছিল না। সুবোধ রেলের গাড়িতে নিদ্রা গেল—কিন্তু অজিতের চক্ষে নিমেষের জন্যও নিদ্রা আসিল না। প্রভাত

হইলে মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ি বদল করিয়া উভয়ে যখন কাশীর গাড়িতে উঠিল তখনও অজিতের মুখে কোন কথাই নাই। সুবোধ তাহার নীরবতার অর্থ বুঝিয়া তাহার মৌন ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল না। গাড়ি যখন বারাণসীর সেতুর উপর আসিল এবং সহযাত্রীদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "ঐ বেণীমাধবের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে—জয় বাবা বিশ্বেশ্বর"। সেই শব্দে অজিতের চিন্তাস্রোতঃ ক্ষণকালের জন্য ভঙ্গ হইল; ঔরঙ্গজেবের মসজিদের গগনস্পর্শী মিনার দ্বয়ের দিকে স্বতঃই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং গঙ্গাতীরস্থ বারাণসী-ধামের সৌধরাজি-শোভিত মনোহারিণী মূর্ত্তি অজিতের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। সকলে যখন পুনরায় সমস্বরে "জয় বাবা বিশ্বেশ্বর" বলিয়া বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিল, তখন অজিতের মস্তক স্বতঃই বিশ্বনাথের চরণোপান্তে প্রণত হইল। কিন্তু তাহার মানসফলক হইতে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বিশ্বদেবতার মূর্ত্তি অপসৃত হইয়া, পুনরায় ইন্দুর চিন্তা, সে স্থান অধিকার করিল। অজিত যতই ইন্দুর আশ্রয় স্থানের নিকটস্থ হইতেছে বুঝিতে পারিল ততই তাহার হৃদয় ইন্দুর অধিকতর নিকটস্থ হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

কাশীতে পৌঁছিয়া অজিত তাহার পিতৃবন্ধু সদানন্দ বাবুর বাটীতে গিয়া উঠিল। সদানন্দ বাবু সদরওয়ালা

ছিলেন, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিয়াছেন। তিনিও একজন জমিদার; এক্ষণে তাঁহার পুত্রই দেশে জমীদারীর তত্ত্বাবধান করেন। অজিতকে দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইলেন এবং অজিতের ও সুবোধের স্নান আহারাদির জন্য নিজে ব্যগ্র হইয়া পরিজনদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অজিতের তৎকালে আহারাদি করিবার জন্য কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু সদানন্দ বাবুর আগ্রহ দেখিয়া ও সুবোধের কষ্ট হইবে ভাবিয়া অগত্যা উভয়ে আহারাদি করিল। আহারান্তে অজিত সদানন্দ বাবুকে বলিল—"আমাদের এখনি একবার গণেশমহল্লায় যেতে হবে, এসে আপনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা ক'ব—কিছু মনে করবেন না—বিশেষ দরকার।" সদানন্দ বাবু বলিলেন—"তার জন্যে আর কি হয়েছে বাবা, কাজটা সেরেই এস। আমার গাড়িতে যাও—এখানে তোমরা অচেনা লোক—আমার দরোয়ান সঙ্গে যাচ্ছে।" অজিত সদানন্দ বাবুর সেই সস্নেহ অনুরোধ রক্ষা করিল।

অজিত কাশীতে একাধিক বার আসিয়াছিল—তত্রাচ সদানন্দ বাবুর দ্বারবান এবং সুবোধ সঙ্গে না থাকিলে গণেশমহল্লায় সাবিত্রীদের যে ঠিকানা ঘনশ্যাম বলিয়া দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অজিতকে কষ্ট পাইতে হইত। সেখানে বাঙ্গালীদের বাস নাই, হিন্দু-

স্থানীরাই থাকে। পাছে কোনও পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ভাবিয়াই সাবিত্রী সেইস্থানে বাসা লইয়াছিলেন। বাটীর দ্বারে পঁহুছিয়া অজিত, সুবোধকে সদর রাস্তায় গিয়া গাড়িতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। বাড়ীটি সদর রাস্তা হইতে দূরে একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে, সেখানে গাড়ি যায় না। দ্বারবানকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অজিত একাকী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটী বহু পুরাতন, অপরিচ্ছন্ন এবং বায়ু ও আলোক বর্জ্জিত বলিলেই হয়। দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া অজিত শুনিল, একজন স্ত্রীলোক উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে,—"ভাড়া দিতে পারবে না—থাকতে এসেছিলে কেন? আমার কি আর ভাড়াটে জুটতো না? ভাড়া যে কোত্থেকে দেবে তাও ত দেখতে পাচ্ছি না—সে দিন ত বাসন কোশন যা কিছু ছেল সব বিক্রী করে দেওর মিনুসেকে দিয়ে দিলে। একটা রাঁধুনীগিরি কাজ জুটিয়ে দিলুম—তাও ত করতে গেলে না—"

অপর একজন স্ত্রীলোক অনুচ্চস্বরে উত্তর দিল—"দু দিন সবুর কর মা—মেয়ে একটু সেরে উঠুক। ওকে এমন অবস্থায় রেখে কি করে রাঁধতে যাই বল? তোমার দু টাকা ভাড়া নিয়ে আমি পালাব না—যেমন করে পারি গতর খাটিয়ে শোধ দেবো—মেয়ে একটু সারলেই—"

প্রথমোক্তা স্ত্রীলোক সে কথায় বাধা দিয়া উচ্চতর কণ্ঠে কহিল—"ও আর সেরেছে। দেখ্‌ছি আমার বাড়ীতেই একটা ভাল মন্দ হবে—আমাকেই শেষে মড়া ফেলার দায়ে ফেল্‌বে। ভাল ঝক্‌মারি করে ভাড়াটে রেখেছিলুম যা হোক্‌। দেখলুম টাকা আছে—দেওর মিন্‌সে এসে থোক্‌ থাক্‌ টাকা নিয়ে যাচ্ছে, গয়নার পুঁটুলি বেঁধে নিচ্ছে। শেষে যে হাঁড়ি চড়্‌বে না, এমন দশা ধর্‌বে তা কি করে জানব বল। ভাল আপদেই পড়লুম যা হোক! কেন বিধবা মানুষের লোক্‌সান্‌ কর্‌ছ বাপু? উঠে যাও না—কাশীতে কি আর জায়গা নেই—"

পুনরায় মৃদুস্বরে উত্তর হইল—"এমন অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাই মা? নাড়া চাড়া কর্‌লে যা প্রাণ টুকু ধুক্‌ ধুক্‌ কর্‌ছে বাছার আমার, তা-ও বেরিয়ে যাবে। এত দিন যখন রেখেছ এ মাসটা থাকতে দাও মা।"

অজিত এবার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল, শেষে যিনি কথা কহিলেন, তিনি সাবিত্রী। অজিতের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—"বাড়িতে কে আছেন গা?" মনের উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে সে নিজের স্বর শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিল। তাহার আহ্বানে হরিশঠাকুর বাহিরে আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিল—"কে মশায় ? কাকে খুঁজছেন ?" পরে অজিতের মুখের দিকে চাহিতেই আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"কে দাদা, তুমি! অজিত বাবু! দাঁড়াও দাদা—খবর দিই—হঠাৎ গেলে মেয়েটা কি সইতে পারবে।" এই কথা বলিয়া হরিশঠাকুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। অজিত দেখিল, হরিশঠাকুরের সেই সদাপ্রফুল্ল মুখে এমন একটা চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণভাব আসিয়াছে এবং তাহার দেহেরও এরূপ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে তাহাকে অন্য স্থানে হঠাৎ দেখিলে হয় ত অজিত তাহাকে চিনিতেই পারিত না। হরিশঠাকুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেই, অজিত শুনিতে পাইল, সাবিত্রী বলিতেছেন—"যাও মা, তোমার পায়ে পড়ি এখন যাও—আর এক সময় এসো।—"

সম্ভাষিতা স্ত্রীলোক অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন—কে এসেছে ?"

হরিশঠাকুর অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "নাত জামাই এসেছেন।" পূর্ব্বোক্তা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—"ওঃ ভারি তালেবর জামাই কিনা—তাকে আবার লজ্জা। ছুঁড়ির গায়ে এমন একটু সোণারত্তি দিতে পারে নি, যে বিক্রী করে ভাড়ার দুটো টাকা ফেলে দেয়। জামাই এসেছে আসুগ্ না, তাতে আমার কি বয়ে গেল ?

আমি আজ হয় টাকা নেব, নয় উঠিয়ে তবে ছাড়্ব। এই আমি এখানে বসে রইলুম্—দেখি কে আমায় ওঠায়।"

হরিশঠাকুর সাবিত্রীর সহিত মৃদুস্বরে কি কথা বলিল তাহা অজিত বুঝিতে পারিল না। পরক্ষণেই হরিশ বাহিরে আসিয়া অজিতকে সাদর-আহ্বান করিল, "এস দাদা এস। আমি ওঁদের যে কত সেধেছি, যে তোমাকে খপর দিই, তা ওঁরা কিছুতেই দিতে দেন নি। যা হোক্ ভগবান তোমাকে এনে দিয়েছেন, নইলে বড় কষ্টই মনে থেকে যেত, হয়ত দেখাই হত না।" ভগ্নস্বরে এই কথা বলিয়া, মলিন পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে, হরিশ অগ্রগামী হইয়া অজিতকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাটীতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই ধূমে মসী-মলিন দেওয়াল বিশিষ্ট, বিরল-আলোক একটী একতলা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হরিশ বলিল, "এস দাদা এই ঘরে এস।" সেই গৃহের বাহিরে সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডায় একখানি খাটিয়া পাতা রহিয়াছে; তাহার পার্শ্বে একজন বর্ষীয়সী বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। অজিত পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও ভাড়া—এখন যাও।"

স্ত্রীলোকটী তীব্র দৃষ্টিতে অজিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "আমি আবার ভাড়াতে যাব কোথায়?

ভাঙ্গিয়ে দাও না?" অজিত উত্তরদিল, "ভাঙ্গাতে হবে না দশ টাকাই তুমি নিও,—এখন যাও।"

স্ত্রীলোক অজিতের দিকে পুনরায় সন্দেহপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "আগাম ভাড়া চুকিয়ে রাখলে—তা বেশ", এই কথা বলিয়া সে আলোকের সম্মুখে ধরিয়া নোট খানি পরীক্ষা করিতে করিতে মন্থরগমনে ক্ষুদ্র উঠান পার হইয়া উপর-তলে উঠিয়া গেল।

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজিত দেখিল, একপার্শ্বে কএকটী মৃত্তিকার হাঁড়ি কলসী, ইট বাহির করা দেওয়ালে এক-গাছি দড়ির আন্‌লায় কয়েকখানি মলিন বস্ত্র, একটী টিনের ছোট তোরঙ্গ ও একখানি খাটিয়া ভিন্ন সেই গৃহে আর কোন ও দ্রব্য-সামগ্রী নাই। খাটিয়ার উপর কে একজন শুইয়া আছে এবং খাটিয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন বিধবা স্ত্রীলোক একখানি পরিস্কৃত ছিন্ন বস্ত্র দিয়া শয়িতার গাত্র ও মলিন শয্যা ঢাকিয়া দিতেছে। অজিত গৃহে প্রবেশ করিতেই বিধবা বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, "এরই একধারে বস, বাবা।" এই কথা বলিয়া খাটিয়ার এক পার্শ্বে অজিতকে বসিতে দিয়া বিধবা সরিয়া দাঁড়াইল। বিধবার কণ্ঠস্বরে অজিত চিনিল যে, তিনিই সাবিত্রী, নতুবা তাঁহারও দেহ এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, যে তাঁহাকেও সহজে চেনা যায় না। খাটিয়ার দিকে চাহিতেই অজিত যাহা

দেখিল তাহাতে সে সাবিত্রীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া খাটিয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। খাটিয়ার উপরে ইন্দুই শয়ন করিয়াছিল। অজিত দেখিল, সুবর্ণলতিকা নিদাঘ রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে, সে তপ্তকাঞ্চন-শ্রী যেন ডাকিনীর কুহক-শ্বাসে নিষ্প্রভ হইয়াছে সেই সুঠাম বাসন্তী-প্রতিমা যেন শয্যার সহিত মিশিয়া আছে। তাহার পূর্ব্ব-লাবণ্যের আর কোন চিহ্ন নাই—কেবল পাণ্ডুর মুখকমলে আয়ত চক্ষু দুইটী জল্ জল্ করিতেছে। তাহার মণিবন্ধে শাঁখা এবং সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু আয়তের চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে, নতুবা তাহার অঙ্গে আর কোন আভরণই নাই। কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া অজিত ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"একেবারে এমন হয়ে গেছে! ডাক্তার দেখান হয়েছিল কি?"

হরিশঠাকুর বলিল, "তা আর হ'ল কৈ দাদা। সেই কল্কাতা থেকেই ত ব্যায়রামের সুরু হোলো—সেই যে ঘনশ্যামটা আসাতে মুর্চ্ছা গেলো সেই অবধি ত আর সার্‌লো না। যখন ডাক্তার দেখাবার টাকা ছিল—তখন ডাক্তার দেখাবার কথা বল্‌লেই বলত, "আমার কিছু হয় নি—শুধু শুধু ডাক্তার এনে কি হবে?" তারপর যখন শয্যাশায়ী হলো—তখন পেটে খাবার টাকা অবধি ঘনশ্যামটা বারে বারে এসে নিয়ে গিয়ে ফতুর করে দিয়ে

গেছে, তা ডাক্তার আন্‌ব কি করে? সরকারী ডাক্তারখানা থেকে বলে কয়ে ওষুধ নিয়ে এলাম—তা খেলে না—বল্‌লে, "আমার আর বেঁচে থেকে কষ্ট পাওয়া বই ত নয়? যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে—আমি ওষুধ খাব না।" সাবিত্রী কত কান্নাকাটি কর্‌লেন, আমি কত বোঝালাম, কিছুতেই খেলে না। সেই অবধি বাবা বিশ্বেশ্বরের একটু করে চরণামৃত এনে দিই, তাই খাচ্ছে।"

অজিত ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "আমাকে খবর দিলেন না কেন? আমার স্ত্রী—আমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে?"

হরিশঠাকুর কহিল, "আমি কি আর সে কথা বলিনি? তা কি করব ভায়া, আমার কথা শুন্‌লে না। সাবিত্রীকে বল্‌লে সাবিত্রী বল্‌ত ইন্দুকে বল, আর ইন্দুকে বল্‌লে ইন্দু বল্‌ত—তোমার স্ত্রী বলে দাবী কর্‌বার ওর নাকি অধিকার নেই। তোমার একখানা ছোট চেহারা ওর মাথার বালিশের নিচে আছে—সেই খানা দিনের মধ্যে দশবার দেখ্‌ছে—বার করে দেখছে আর কাঁদ্‌ছে—কিন্তু তোমাকে খবর দেবার কথা বল্‌লেই বলত, "না—তা কিছুতেই হবে না।" তোমাকে যদি খবরই দিতে দেবে—তা হলে কি আর ঘনশ্যাম যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়ে এমন করে ধনে প্রাণে মেরে যেতে পার্‌ত দাদা?"

অজিত রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "ঘনশ্যাম মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে ঐ টাকাগুলো নিয়ে গেছে—তা জানেন কি?"

সাবিত্রী চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিথ্যে বাবা?"

অজিত কহিল, "ইন্দুর সঙ্গে সেই দিগম্বর গাঙ্গুলীর বিয়ের কথাটা। সে বিয়ে হয় নি—ঐ ঘনশ্যামই মিছে করে সেই কথা বলে—"আপনার স্বামীকেও ঠকিয়ে বিয়ের খরচের টাকা নিয়েছিল—আর আপনাদেরও এই সর্ব্বনাশ করেছে।"

সাবিত্রী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হয় নি!—সে বিয়ে হয় নি?"

অজিত বলিল, "না হয় নি—বিয়ে দিতে ঘনশ্যাম নিয়ে গিয়েছিল বটে—কিন্তু বিয়ে হয় নি।"

সাবিত্রী উন্মত্তার ন্যায় আপনার মনে পুনরায় বলিলেন,—"হয় নি—বিয়ে হয় নি!" পরে ইন্দুর দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"ও ইন্দু—ইন্দু! শুনছিস্?

ইন্দুর নিস্পন্দ চক্ষুপল্লবে পলক পড়িল—তাহার নয়ন-কোণে মুক্তার মত কয়েকটী অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়া উপাধানে ঝরিয়া পড়িল। সাবিত্রী ব্যস্ত হইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দু তাহার শীর্ণ হস্ত সঞ্চালন করিয়া ব্যজন বন্ধ করিতে

ইঙ্গিত করিল এবং অজিতের দিকে চাহিয়া কি বলিল—কিন্তু অজিতের কর্ণে তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পঁহুছিল না। অজিত ব্যগ্র হইয়া ইন্দুর মুখের কাছে আপনার মস্তক নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

ইন্দু ধীরে ধীরে বলিল—"পা তুলে ভাল হয়ে বোস না।"

অজিত পদদ্বয় খাটিয়ার উপর তুলিয়া বসিতেই, ইন্দু অজিতের পদধূলি লইবার মানসে তাহার চরণযুগল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত আপনার মস্তকে স্থাপন করিল; কিন্তু সেই সামান্য আয়াসে, অথবা মনের উত্তেজনায় ইন্দুর হস্ত কম্পিত হইয়া তাহার মস্তকের উপাধানের উপর শিথিল হইয়া পড়িল। তাহার ললাটের উপর স্বেদকণা বিন্দু বিন্দু হইয়া দেখা দিল। অজিত ব্যগ্র হইয়া হরিশ-ঠাকুরকে বলিল, "ভারি কাহিল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওষুধ টষুধ না খাইয়ে এখান থেকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারব না দেখ্‌ছি। আপনি বাইরে গিয়ে সুবোধকে এক-জন ভাল ডাক্তার—যাকে পায়,—ডেকে আনতে বলুন দেখি। সুবোধ আমার বন্ধু—বড় রাস্তায় গাড়ীতে বসে আছে। বাইরে দরোয়ান আছে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। অন্য বাড়ীতে না নিয়ে গেলে সিভিল সার্জ্জনকে আন্‌তে পারব না। শীগ্‌গির আস্‌তে বল্‌বেন,—আচ্ছা আমিই না হয় যাচ্ছি।" এই

কথা বলিয়া অজিত উঠিতে যাইতেই ইন্দু তাহার হস্ত ধরিল এবং ভীত-কণ্ঠে বলিল, "তুমি যেওনা।"

অজিত বলিল, "ভয় কি? এখ্‌খুনি আস্‌ছি।"

ইন্দুর বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে করুণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে বলিল, "না, এখন আর আমার ভয় কি?" পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "আর জন্মে বড় মহাপাতক করেছিলুম তাই তোমাকে পেয়েও এতদিন প্রাণখুলে তোমাকে আমারই বলে ভাব্‌তে অবধি পারিনি,—সে কি কম কষ্ট! যা'হোক বিশ্বনাথ এই খানেই সে মহাপাতকের শেষ করে দিলেন। এখন আমার ভয়, দুঃখু, লজ্জা কিছুই নেই।" এই কথা বলিতে বলিতে ইন্দুর নয়নকোনে পুনরায় অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অজিত রুমাল দিয়া ইন্দুর অশ্রু মুছাইয়া দিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "আর কথা কয়ো না—কষ্ট হবে।"

ইন্দু করুণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমার আর কষ্ট কি? তোমাকেই আমি না জেনে—না বুঝে—বড় কষ্ট দিয়েছি—ক্ষমা কোরো। মাকে—দাদামণিকে দেখো" শেষের কথা কয়টা বলিতে গিয়া ইন্দুর চক্ষুদ্বয় পুনরায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। অজিত ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওসব কি বল্‌ছ, তোমাকে সারিয়ে তুল্‌বো, ভয় কি?" পরে হরিশের দিকে

চাহিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল,—"তবে আপনিই যান, সুবোধকে বলে আসুন, দেরী করবেন না।"

হরিশঠাকুর বাহিরে যাইতেই অজিত দেখিল ইন্দু অপলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অজিত ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। অজিতের স্নেহস্পর্শে ইন্দুর ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কি যেন এক গভীর তৃপ্তিতে সে তাহার নয়নপল্লব নিমীলিত করিল।

তারপর ?

তাহার পর কি হইল সে কথা না হয় না—ই বলিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত

শান্তি

উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। ।৹ মূল্য ৸৹ মাত্র

"যাঁহারা বলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা, পূর্ব্বরাগ (courtship) প্রভৃতি পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার এতদ্দেশে প্রচলিত না থাকায় ভাল উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে না তাঁহারা একবার এই উপন্যাস খানি পাঠ করিলেই তাঁহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে।"—দর্শক

"It is an excellent book depicting with a masterly pen, a striking aspect of a Bengalee family, which will be read with interest by every reader."

INDIAN EMPIRE.

"লেখকের রচনা কৌশল সুন্দর; পল্লীগ্রামের জমীদারের অত্যাচার, ঘটকের ব্যবহার, নূতন বড়মানুষের বাবু গিন্নি, বরযাত্রীদিগের ব্যবহার প্রভৃতির সুন্দর চিত্র এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।"—হিতবাদী

"We have no hesitation in saying that it will prove an interesting and instructive study to its readers."

A. B. PATRIKA.